আলাদিন জিন্দাবাদ

আলাদিন জিন্দাবাদ
কিঙ্কর আহ্সান

উৎসর্গ

নিগার দীপা, তামান্না কলিম, শাওলিন খন্দকার

আপনাদের জন্য লেখালেখি থামানোর উপায় নেই।
এভাবেই ভালোবাসুন। এভাবেই বিরক্ত করুন

সন্ধের রোদ পড়িয়েছে মুকুট ঘাসে
স্রোত ভরা জলে ছেড়ে পদ ছাপ তারা আসে

সূচি

অপভ্রংশ	১১
পাতার নৌকায় দৃশ্যপট	১৯
গুল্লি	২৭
আলপিনে কুয়াশা	৩৭
দিনলিপি-রাতলিপি	৪৩
দেশলাই-জীবন	৪৯
শিরোনাম ডায়েরি	৫৭
জমাটি দুঃখ-সুখ	৬৫
রক্ত, কষ্ট, শোক	৭১
ত্রিচারিণী	৭৯
পুরুষরা এবং নারী	৮৫
আলাদিন	৯৩

অপভ্রংশ

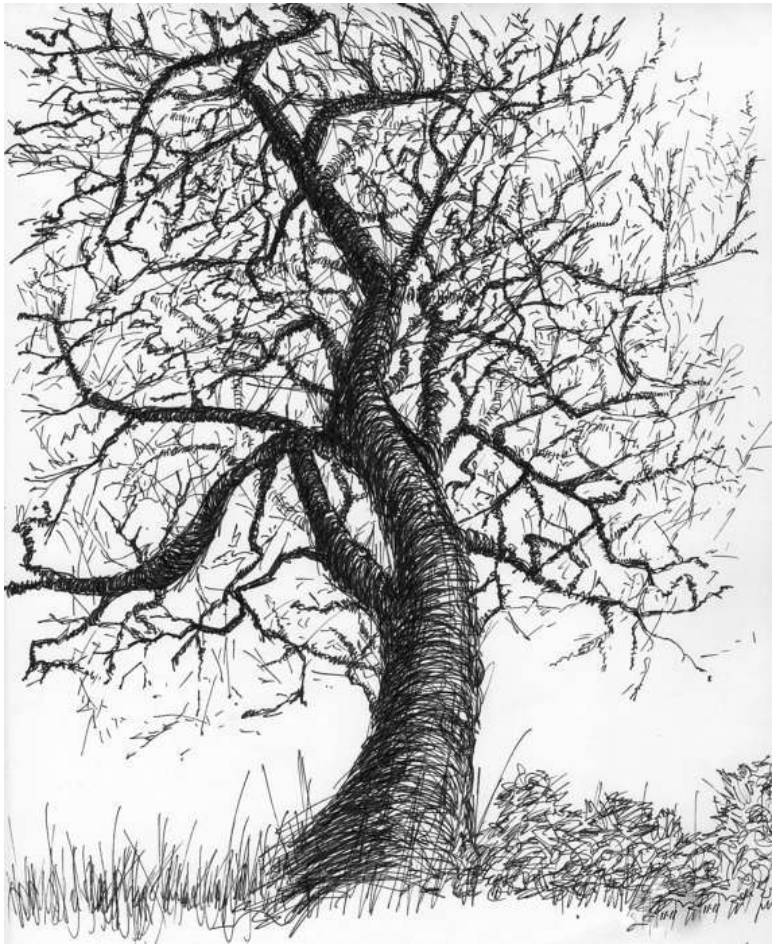

কচুরিপানা, টগর, সবুজ শ্যাওলা-ময়লার আড়ালে লাশটা চোখে পড়ে না।

কালবোশেখির সময়। ঝড় নিয়ম মেনে আসে না। হুটহাট অল্প কিছুক্ষণের জন্য এসে আবার চলে যায়।

নতুন জামাইয়ের মতো দেমাগ। এত বেশি ডাঁট দেখায় যে তার চালচলন বোঝা কঠিন হয়ে যায়। ঝড়ের শেষে বৃষ্টি শুরু হয়। মেজাজ খারাপ করা বৃষ্টি। এই বৃষ্টিতে খিচুরি জমে না। জমে কাঁদা। ভাঙা-ভেজাল রাস্তাঘাট গলে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। পানিতে ভেসে যায় চারপাশ। একদম বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। ভেজা, স্যাঁতসেঁতে সব।

চলাফেরার জন্য রিকশাই ভরসা। জলের ভেতর রিকশার প্যাডেল ঘোরানো কষ্টের। বহুত পরিশ্রম রিকশাওয়ালাদের। পানির ভেতর গাড়িগুলোর ইঞ্জিন বন্ধ। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে যানবাহনগুলো। মাঝে স্টার্ট নেবার চেষ্টা চলে। ড্রাইভারদের হুদাই কষ্ট। ভুশ ভুশ বার কয়েক আওয়াজ তুলে আবার বন্ধ হয়ে যায় ইঞ্জিন। শুধু শুধু শব্দদূষণ। ধুর।

মারুফ মারা গেছে। মারুফের বয়স চৌদ্দ। বাড়ন্ত শরীর। গোঁফ গাঢ় ভালোই হয়েছিল নাকের নিচে। প্রতিবাদী ছেলে। ক্রিকেট খেলে। বাবা তার সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরে চাকরি করে। মা গৃহিণী। একমাত্র ছেলে। আদরের শেষ নেই ঘরে। এই ছেলে মরলে কষ্টটা বেশিই হয়।

মারুফের মা তাই কাঁদে। প্রথমে একা একা। তারপর পাড়া-প্রতিবেশী সবার মাঝখানে গোল হয়ে বসে। সে কী কান্না। কালবোশেখি ঝড়ের মতো তীব্র, ভয়ংকর। বুকের ভেতর কেমন করে। তার কান্না দেখে পরিচিত-অপরিচিতও কয়েকজন কেঁদে ওঠে। ভাও দেখে কোরাসে কান্না শুরু হয়। কোনটা মারুফের জন্য আর কোনটা এমনি এমনি কান্না, বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

মারুফের বাবাও কাঁদে। বোঝা যায় না তার কান্না। আওয়াজ হয়। চোখের দিকে তাকালে লাল ভাবটা বোঝা যায়। পলক ফেললেই পড়ে অশ্রু। গাল বেয়ে নিচের দিকে। এই নীরব কান্নায় কষ্ট বেশি। একমাত্র ছেলে, একমাত্র ছেলে, একমাত্র ছেলে এই ব্যাপারটাই পোড়ায় বেশি। যেন অনেক ছেলেমেয়ে থাকলে এই ছেলেটা হারানোর কষ্টটা খুব একটা তীব্র হতো না!

মানুষের অনেক কাজ। মারুফের মাকে ঘিরে ভিড় কমে। বাড়িতে চলে যায় সবাই। বিছানা গরম করে। ঘুমায়। যারা হতভাগা তারা ছুটির দিন নয় বলে অফিসে কাজ করে। কাজে মন বসে না। তাসই পেটানো হয়। কলব্রিজ খেলা চলে জমজমাট।

এই লোকালয়, কোলাহল, মানুষের ভিড়ে থেকেও প্রথমবারের মতো মারুফের বাবা-মা একা হয়ে যায়। কী নির্মম নিঃসঙ্গতা। তাদের জন্য মন খারাপ লাগে। পাষাণের চোখও অল্প ভিজে যায়।

মারুফের কবর দেওয়া হয়। মিলাদের আয়োজন হয়। নিমকি, মিষ্টি, অমৃতি খেয়ে খুশি হয় সবাই। এতই খুশি যে মারুফের জন্য দোয়া করতে ভুলে যায়। আমৃতির স্বাদে হারিয়ে যাবার সময় এই সব অযথা দোয়া-দরুদ যন্ত্রণা মনে হয়।

তারপর দিন যায়। এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ। সবাই যে যার মতো ব্যস্ত। পাড়ার খেলার মাঠটায় মারুফ নামের ছেলেটা যে দাপিয়ে বেড়াত, সে যে এখন আর নেই, তা নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা থাকে না। মারুফের স্কুলে তার শিক্ষকরা মারুফের রোল নম্বর ডাকতে গিয়ে একদমই ভুল করে না। মানুষের নাম মুছে যেতে খুব কি সময় লাগে?

মারুফের বাবা জানে, বিশ্বাস করে, তার ছেলের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। এমনি এমনি ডোবার পানিতে লাশটা ভেসে উঠতে পারে না। খেলার মাঠ থেকে ডোবা অনেক দূর। বিকেলবেলা খেলতে গিয়েছিল। তারপর টানা দুই দিন উধাও। ডোবার কাছে মারুফ কেন যাবে?

দুই দিন পর লাশ পাওয়া গেল ডোবায়। আরো আগে পাওয়া যেত। কচুরিপানার আড়ালে ছিল বলে চোখে পড়েনি শুরুতেই। কঠিন ধাঁধা। অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর নেই। মারুফের বাবা উত্তর জানতে চায়। লাশের ময়নাতদন্তও হলো না। পুলিশ এসে একবার ঘুরে গিয়েছিল শুধু। পুলিশের কত কাজ! এসব মারুফ-টারুফ নিয়ে পড়ে থাকলে হবে না।

মারুফের বন্ধু ইশতিয়াক। প্রাণের বন্ধু। এই ছেলের বাবা পুলিশের ইন্সপেক্টর। ইন্সপেক্টর হানিফ। তার কাছে যায় মারুফের বাবা। তার সন্দেহের কথা জানায়। সব শোনেন হানিফ সাহেব। তিনি ভালো শ্রোতা। সব শুনেও চিন্তিত মনে হয় না হানিফ সাহেবকে।

গরিব দেশে লোকসংখ্যা অনেক বেশি। একটা দুটো মানুষ মরে গেলে ক্ষতি নেই, বরং লাভ। অযথা এই সব তদন্তে সময় নষ্ট। ইশতিয়াক গোঁ

ধরে। বন্ধুর এমন মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না। 'কী যন্ত্রণা! কী যন্ত্রণা!' বলে হানিফ সাহেব তাই শেষ পর্যন্ত বাধ্য হন খোঁজখবর নিতে।

খেলার মাঠের পাশে ইলিয়াস শাহির মাজার। পীর বাবা তিনি। ভক্তের শেষ নাই। ফকির থেকে ধনী সবাই তার ভক্ত। ইলিয়াস শাহি বছর পনেরো আগে এসেছিলেন এ এলাকায়। খেলার মাঠের পাশটায় বসে থাকতেন চুপচাপ। ঝিমোতেন। জট পাকানো চুল। কখন খেতেন, কখন ঘুমাতেন, কারো জানা নেই। একজন, দুজন কৌতূহলী হয়ে বসে থাকত তার পাশে। চুপচাপ। যাদের কাজ নেই, তারা ভিড় করত। একজন, দুজন থেকে ধীরে ধীরে লোকসংখ্যা বাড়তে লাগল। ইলিয়াস শাহি কোনো কথা বলতেন না। কাউকে আসতে বলতেন না, যেতেও বলতেন না। তার নাম যে ইলিয়াস শাহি, এটাও নিশ্চিত কীভাবে হলো সবার জানা নেই। শিষ্যরা ভিড় করে। রাতে থেকে যায়। সাধারণ মানুষ জমে যায়। তারা পীর বাবার কাছে সমস্যার সমাধান চায়। দুঃখ ভুলতে চায়। মানুষের দুঃখের শেষ নেই।

শত শত মানুষ। হাজার হাজার মানুষ। তারা রাতে থেকেই যায়। তাদের থাকার জন্য, খাওয়ার জন্য ঝমঝম করে দোকানপাট উঠতে থাকে। ব্যবসা জমে। মাইক ভাড়া করে আনা হয়। কয়েকজন চতুর শিষ্য মাইক নিয়ে আসে। মাইক্রোফোন নেওয়া হয় পীর বাবার সামনে। ঝিমোতে ঝিমোতে তিনি ফুঁ দেন। ফুঁয়ের আওয়াজ পৌঁছে যায় সব জায়গায়। যারা যারা শুনতে পায়, তাদের সব মুশকিল আসান। শত শত টাকার খেলা। অনেক অনেক উপঢৌকন। এই না হলে মাজার!

পীর বাবা মরে যান। সবার মৃত্যু, জরা দূর করলেও নিজেরটা ঠেকানো যায় না। কিছুদিন পর ভিড় কমতে থাকে। বাবা নেই। ভিড় করে কী লাভ? কয়েকজন নতুন পীরের সন্ধানে অন্য কোথাও যায়। ব্যবসা পড়ে যায়।

বাবার শিষ্যরা হতাশ হয়। গাঁজা, হেরোইন, ফেনসিডিল খাওয়া শিষ্যরা মাজার আঁকড়ে পড়ে থাকে। ধনী শিষ্যদের হাত-পা ধরে, পীর বাবার প্রতি ভালোবাসার দোহাই দিয়ে টাকা আনা হয়। মাজার বড় হয়। জমে ওঠে আড্ডা। ব্যবসাও। হেরোইন, গাঁজা ফেনসির দিনগুলো বড় আনন্দে কাটে। পুলিশও বখরা পেয়ে বিরক্ত করে না। বড় ভালো দিন। বড় ভালো এই পৃথিবী।

মাজার নিয়ে কারো কিছু বলার সাহস নেই। একবার তো পুলিশের সাথে গোলাগুলিও হলো। শিষ্যদের টাকা আছে। টাকা থাকলে, হেরোইন-ফেনসি খেলে এক-আধটা মেশিন রাখতে হয় সাথে। এটাই নিয়ম।

হানিফ সাহেবও বখরা পান। তাই আর ঘাঁটান না এখানকার কাউকে। খুব বেশি প্রয়োজন হলে একটা-দুটো লোককে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। ছেলের মন রাখতে মারুফের জন্য দুটো লোক থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারা ছাড়াও পায় তাড়াতাড়ি।

মারুফের বাবা এসব মেনে নিতে পারে না। মারুফের মা কাঁদে। ছেলের জন্য কাঁদে। 'ওরে মারুফ, কারে নিয়া থাকি আমি।' এই বলে চৌপর দিন তার বিলাপ চলতেই থাকে। মারুফের বাবা দিনে দিনে কেমন যেন হয়ে যায়!

হানিফ সাহেবকে বিরক্ত করতে থাকে। মনে হয় হানিফ সাহেব কিছু একটা করতে পারবেন। কিন্তু সমাধান আসে না। বিরক্ত হন একসময় হানিফ সাহেব। অপমান করে তাড়িয়ে দেন মারুফের বাবাকে।

অফিস কামাই হয় মারুফের বাবার। ঘরে বসেই কাটে লোকটার। চুপচাপ নিজের ঘরে বসে থাকে। মারুফের মায়ের কান্না দেখে। তাকে থামানোর চেষ্টা করে না। লম্বা ছুটি নেওয়া হয় অফিস থেকে। ব্যাংকের টাকায় দিন চলে।

খেয়ে না খেয়ে দিন কাটে। টাকার অভাবে খাওয়া হচ্ছে না তা নয়। মারুফের বাবা-মা কারোরই খেতে ইচ্ছে করে না। মারুফের বাবা ঘরে শান্তি পায় না। শান্তির জন্য অবশেষে পীর বাবার মাজারে গিয়ে ওঠে। সেখানেই দিন কাটে। মারুফের মায়ের এ নিয়ে অভিযোগ নেই। পৃথিবীর কোনো কিছু নিয়েই এখন আর ভাবে না সে।

মারুফের বাবা গাঁজা খায়। ফেনসি খায়। হেরোইনও খাওয়া শুরু করে। পীর বাবার সাধনা। এত সহজ নয়। মাজার থেকে খেলার মাঠ চোখে পড়ে। মারুফের বাবা প্রতি বিকেলে ঝিমোতে ঝিমোতে খেলা দেখে। মারুফের কথা মনে পড়ে তখন। চোখ ভিজে যায়।

মারুফ এই মাজারে গাঁজা খাওয়ার প্রতিবাদ করেছিল। মাজার বাড়তে বাড়তে খেলার মাঠ দখল করে ফেলতে যাচ্ছে–এর প্রতিবাদ। ভণ্ডপীরের প্রতিবাদ। ছেলেটা অল্প বয়সে বেশি লায়েক হয়েছিল। তাইতো মরতে হলো। বেশি বোঝা ভালো না। শক্তিশালীদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে নেই, এটা ছেলেটার জানা নেই।

মাঝে একবার হানিফ সাহেব এসেছিলেন মাজারে। বখরা নিতে। দেখা হয়ে যায় মারুফের বাবার সাথে। মারুফের বাবা এখন পাগল মানুষ।

নেশাখোর। তার সামনে চক্ষুলজ্জা থাকতে নেই। এসব নিয়ে তাই আর মাথা ঘামাননি হানিফ সাহেব। তিনি অন্য ঝামেলা নিয়ে আছেন। মারুফের বাবাকে নিয়ে ভাবলে তার চলে না।

ইশতিয়াক মাজারের লোকজনদের বিরুদ্ধে লেগেছে। মাজার দখল নিয়ে নিয়েছে খেলার মাঠটার। লোকসংকুলান হওয়া প্রয়োজন। ছেলের ব্যাপারে হানিফ সাহেবকে বলা হয়েছে। ইশতিয়াক লোকজন জোগাড় করছে। আউট বই পড়ে ছেলে নষ্ট হয়েছে। হানিফ সাহেব ছেলেকে মেরেছেন। ঘরে আটকে রেখেছেন কয়েক দিন। চৌদ্দ-পনেরো বছরের ছেলেকে ঘরে আটকে রাখা যায় না। অফিস করবেন, না ছেলের খোঁজ রাখবেন, ভেবে পান না হানিফ সাহেব।

পিঠেপিঠি দিন যায়। শিষ্যরা ইশতিয়াকের বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হয়। তারপর একদিন ডাক আসে ইশতিয়াকের। ক্ষমতা থাকলে ভগবান, পীর সব হওয়া যায়। যে কারো বেঁচে থাকা, মরে যাওয়া ঠিক করা যায়। প্রচণ্ড ক্ষমতায় শিষ্যরা এক-একজন ভগবান, পীর হয়ে যায়। ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায় ইশতিয়াকের। তারপর ইশতিয়াকেরও লাশ পাওয়া যায়।

প্রথমে চোখে পড়ে না। কচুরিপানা, টগর, সবুজ শ্যাওলা-ময়লার আড়ালে থাকবার কারণে চোখে পড়ে না। মারুফের লাশটা যেখানে পড়েছিল, ঠিক সে জায়গাতেই, তার পাশেই পাওয়া যায় ইশতিয়াকের লাশ।

ছেলের মৃত্যুতে হানিফ কাঁদেন। খুব কাঁদেন। সেদিন টপাটপ কনস্টেবলরা চার-পাঁচটাকে ধরে নিয়ে আসে মাজার থেকে। তবে তারা ছাড়া পেয়ে যায়। শিষ্যরা ক্ষমতাবান। আটকে রাখা যায় না তাদের। পরাজিত হানিফ সাহেব কাঁদেন।

শিষ্যরা আরো শক্তিশালী পীর হয়ে ওঠে। শক্তিশালী ভগবান হয়। মানুষের ভক্তি বেড়ে যায়। মানুষ বরাবরই ক্ষমতাবানদের তোয়াজ করে চলে। ছি মানুষ! ছি!

ইশতিয়াকের জন্য মারুফের বাবার খারাপ লাগে। সে একটু কাঁদেও। মাজারে বসে গাঁজায় শেষ টান দিয়ে ইশতিয়াক মরার পরপরই তিনি অফিসে যান। অনেক লম্বা ছুটি নেওয়া হলো। এবার কাজ করা দরকার। নইলে চাকরি থাকবে না। মাজারে থাকার আর দরকার নেই। মাজারের দিন শেষ হলো অবশেষে। অবশেষে।

২.

একদিন শেষ বিকেলে বারান্দায় চুপচাপ বসে থাকে মারুফের বাবা আর মা।

বসে থাকে পাশাপাশি।

একটা চড়াই এসে বসে তাদের কাছাকাছি।

দুটো মানুষ আর এক চড়াইয়ের কাটানো বিকেলের শেষভাগ।

তিনটি প্রাণ পাশাপাশি হলেও একা লাগে দেখতে। কী কঠিন নিঃসঙ্গতা!

মারুফের কথা মনে করে আজ মারুফের বাবা কাঁদে।

মারুফের মা স্বামীর চোখের জল মুছে দেয়। লম্বা কথা বলে। বলে, 'তুমি পাপ করো নাই গো। ছেলের জন্য করছ। আল্লাহ আছেন। তিনি মাফ কইরা দিবেন। তিনি বুঝবেন। তুমি পাপ করো নাই। হানিফ সাহেব শাস্তি পাইছে। ইশতিয়াক তোমারে মাফ কইরা দিবো। দুই বন্ধু একসাথে আছে। ভালো আছে। তুমি কাঁইদো নাগো মারুফের বাপ।'

স্ত্রীর কথা শুনেও মারুফের বাবার কান্না থামে না। মানুষ হত্যা মহাপাপ। সে তাই করেছে। ইশতিয়াক যে তার ছেলের মতো। তার ক্ষমা নেই। সে কাঁদে। মাজার তো বন্ধ হলো না। মাজারটা বন্ধ হবার দরকার ছিল।

হানিফ সাহেবের করা অপমান গায়ে লেগেছে। মারুফের বাবার অপমানবোধ এত প্রবল জানা ছিল না। সেই প্রতিশোধ ইশতিয়াককে মেরে নেওয়া হলো। ঠিক হলো?

কাঁদতে কাঁদতে শেষ বিকেল সন্ধে হয়, রাত হয়। চড়াই যায় না। মারুফের বাবা আর মা বসে থাকে পাশাপাশি। সাথে থাকে চড়াইটাও। মারুফের বাবাকে দেখে চড়াইটা অবাক হয়।

এই মুহূর্তে তার ছোট্ট বুকের ভেতর লুকিয়ে থাকা মনে একটাই প্রশ্ন, 'মানুষের চোখের জলের কি শেষ নেই?'

এই প্রশ্নের জবাব আছে?

মারুফের বাবা কাঁদে। কাঁদুক।

পাতার নৌকায় দৃশ্যপট

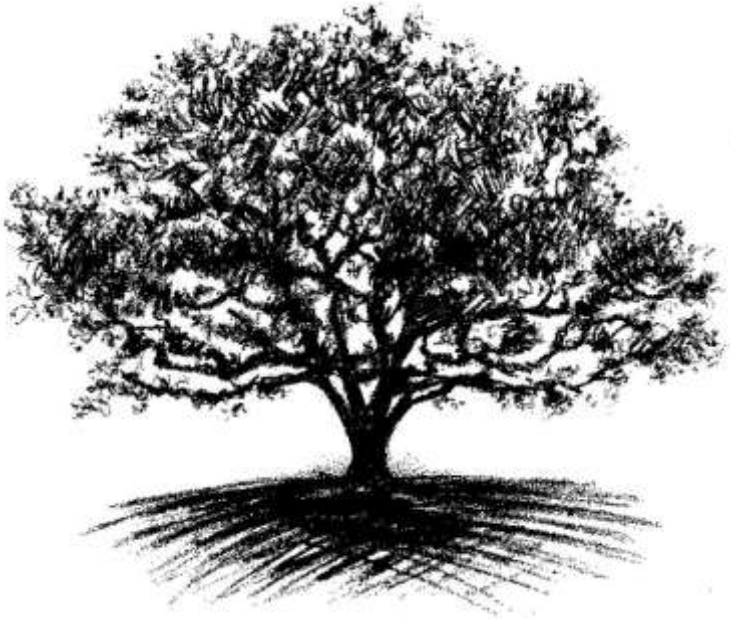

সোনালি পোকা

ক.

বালকের মন ভালো নেই।

উঠোনে মাদুর পেতে বসে সকাল থেকে সে পড়েই যাচ্ছে, 'চতুর্ভুজের চার বাহু। চার বাহু...।' পড়ায় মন বসছে না।

বাড়ির রাজহাঁসগুলো ঘুরছে এদিক-সেদিক। কখনো তারা বালকের একদম কাছাকাছি চলে আসে। গায়ে ঠোকর দেয়। একসময় তার মা এসে মাটির পাত্রে ভাঙা শামুক দিয়ে যায় রাজহাঁসগুলোর জন্য। মনোযোগ দিয়ে খেতে থাকে হাঁসগুলো।

সকাল হয়েছে সেই কতক্ষণ। বালক বই বন্ধ করে। আজ আর পড়া হবে না। রোদের ছিটেফোঁটাও নেই কোথাও। আকাশ মেঘে ঢাকা। এই দিনের বেলাতেই ভর করেছে অন্ধকার।

ঝড় হবে। কঠিন ঝড়। এখন কালবৈশাখীর সময়। কদিন পরপরই ঝড় হয়। ঝড়ের পর শুরু হয় একটানা বৃষ্টি।

'লুডু খেলবি?' বালকের বড় বোন তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে কথাটা বলে। তার হাতে চিতই পিঠা। সে আয়েশ করে খেতে খেতে বাইরের কালো আকাশ দেখতে থাকে।

'ধুর। এই সব ফালতু খেলা। আমি লুডুটুডু খেলি না।' বলে বালক। বড় হচ্ছে সে। দৈর্ঘ্যে বড় বোনকে ছাড়িয়ে যাবে আর কয়েক দিন পরই। তার এখন বাচ্চাদের মতো এসব খেলা মানায় না। সে গম্ভীর থেকে সব সময় বড়সুলভ একটা ভাব ধরে। যেন তার অনেক ব্যস্ততা। অনেক কাজ।

একটু পরই শুরু হয় ঝুম বৃষ্টি। মেঘগুলো সব পড়ে রুপোর মল। জল ঝরিয়ে কাঁদে।

এই ঝড়-বৃষ্টির ভেতর একটা সোনালি পোকা আটকা পড়ে ঘরে। সোনালি জরি যেন লেপে দেওয়া ওর শরীরজুড়ে। কী সুন্দর!

বালকের এসব দিকে খেয়াল নেই। সে দাঁড়িয়ে থাকে উঠোনের মাঝখানটায়। বৃষ্টির প্রবল ঝাপটা এসে লাগে গায়। ঝাপসা হয় চোখ।

দারুণ গতিতে পড়ছে শিল। হাঁস-মুরগিগুলো ঠাঁই নিয়েছে খোপে (হাঁস-মুরগির থাকার ঘর)। ওদের খাবার ভাঙা শামুকের টুকরো আর বাসি গন্ধের নরম আঁশটে মাংস মাটির সাথে মিশে ভিজে ভিজে কাঁদা হয়।

বালক শিল কুড়োয়। ছোট ছোট আঙুলের হাতের মুঠোয় যতটা এঁটে নেওয়া যায়, ততটুকু শিল নেয় সে।

মাঝে মাঝে লুকিয়ে মুখে পোরা হয় দু-এক টুকরো বরফ। কোঁত করে গিলে ফেলে সে। বড় বোন দেখলে বলে দেবে মাকে। এর আগের বার শিলটিল খেয়ে বাঁধিয়েছিল জ্বর। হয়েছিল টনসিলের ব্যথা।

লুকিয়ে তাড়াহুড়ো করে শিল গিলতে গিয়ে সে ভাবে, ইশ্, একটু যদি বরফের গায়ে চিনি মাখিয়ে নেওয়া যেত, তবে পাওয়া যেত আইসক্রিমের স্বাদ!

বড় বোনটার অবশ্য শিল নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই। তার চোখ খুঁজছে আম। ঝোড়ো হাওয়ায় গাছ থেকে পড়ে যাওয়া লিলিপুট আকারের টক আম। আমবাগানে গিয়ে ভেজা রঙিন ফ্রক পরে ছুটে ছুটে আম কুড়োয় বোনটা।

আম কুড়োতে গেলে বড় বোনটার সঙ্গী হয় মুনি। পাশের বাড়ির মেয়ে। বড় ন্যাওটা তার। সারাটিক্ষণ থাকে সাথে সাথে।

আজ মুনি নেই বলে আম কুড়ানোতে জুত পাওয়া যায় না। বোনের মনটা তাই ভারি খারাপ হয়।

বালক মুনির কথা জিজ্ঞেস করতেই খেপে গিয়ে বলে, ' মুখপুড়িটার কথা বললে দেব বসিয়ে কিল পিঠে। ও না আসলে কি আম কুড়োনো হবে না আমার? আমি একাই একশো বুঝলি?'

বোনের কণ্ঠে অভিমান। তার কষ্টটা বোঝে বালক। আহারে!

বালকের সাথে আবার বনে না মুনির। মুনিকে সে ডাকে 'ডাইনি বুড়ি'। বুড়িটা সারা দিন খেপায় ওকে।

ছোটবেলা থেকেই কোলে কোলে থাকার অভ্যেস বালকের। এর কোল ওর কোল হয়ে কত জায়গায় ঘুরেছে সে। কোলছাড়া হয়নি কখনো। ভূমি থেকে কিছুটা ওপরে থাকাই নিরাপদ মনে হয় তার। এখনো তাই এতটা বড় হয়েও সুযোগ পেলে কোলে ওঠার চেষ্টাটা করে বালক।

এসবের জন্য অবশ্য ভেংচি কাটে মুনি। ডাইনির মতো চোখ বড় বড় করে বলে, 'বুড়ো খোকা, কদ্দিন আর থাকবি কোলে কোলে। তুই তো দেখি দুধের শিশুই রয়ে যাবি জীবনভর।'

শুনে বালকের কষ্ট হয়। দম বন্ধ হয়ে যেতে চায়। চোখের কোলে চিকচিক করে জল।

বুড়িটা খেপাবে বলে ওর সামনে কাঁদাও যায় না। তাই বাড়ির সামনে পানের বরজটার আড়ালে গিয়ে কেঁদে নেয় একটু।

বালকের খেলা নিয়েও বুড়িটার হাজারো অভিযোগ। কুতকুত (এক্কা-দোক্কা), রান্নাবাটি, বউচি, ফুল টোক্কাটুক্কি এসব খেলতেই বেশি ভালো লাগে বালকের। কিন্তু বুড়ি মুনিটা বলে এসব নাকি মেয়েদের খেলা। ছেলেদের খেলা হলো চাঁড়া মারা, ছিপ দিয়ে পুঁটি মাছ তোলায় পাল্লা দেওয়া আর মার্বেল নিয়ে টইটই করে ঘুরে বেড়ানো।

খেলার আবার মেয়েছেলে কিরে বাবা! খেলা তো খেলাই। বালক বোঝে না এসব কিছু।

সে খেলতে গেলেই মুখ ঝামটা দেয় বুড়িটা। খেপায়।

মাঝে মাঝে খুব রাগ হয় বালকের। ভাবে, দেবে আড়ি। চিরদিনের জন্য। হবে না কথা কখনো আর। কিন্তু মুনির সাথে যে ওর ভাব জমানোর শখ। একদিন বুড়িটার রাগী মুখ না দেখলে কেমন কেমন জানি লাগে। সারাটা দিন বড্ড না ভালো লাগার মাঝ দিয়ে কেটে যায় সেদিন। তবে রাগ করুক মুনিটা। ওর জন্য এইটুকু রাগ না হয় সহ্যই করল বালক।

তা ছাড়া মুনি পছন্দ করে না বলে সে মেয়েদের খেলা, ফালতু খেলা বাদ দিয়েছে। কষ্ট হলেও অপছন্দের খেলা খেলে চেষ্টা করছে বড় হবার।

মাঝে মাঝে বালক ম্যাচের খোসা জমায়। লাল, নীল হরেক রকমের ম্যাচ। কখনো বাজার থেকে নিয়ে আসা হয় ভুনভুনি (সুইট বল)। টিপু সুলতান আর ম্যাকগাইভারের ছবি সাঁটা এসবের প্যাকেটে। সব জমা মুনির জন্য। দিতে সাহস হয় না বালকের। যদি বকে এই ভয়ে।

আকাশে মেঘেরও অনেক ওপর দিয়ে ধোঁয়ার লেজ নিয়ে যখন রকেট যায়, তখন বুড়িটাকে দেখাতে ইচ্ছে করে। দেখাতে ইচ্ছে করে এক ঠ্যাং এর গো বক কিংবা পুকুরে পোঁতা বাঁশের ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা কোনো মাছরাঙাকে। হয় না কিছুই দেখানো। মুনির এত সময় কই! অল্প বয়সেই পুরো পৃথিবীর ভার যেন তুলে নিয়েছে সে মাথায়। সংসারে কতই না কাজ তার!

যত্তসব! মেজাজটাই খারাপ হয়।

এত এত কাজ করার কি দরকার আছে, বোঝে না বালক। মুনিকে খুশি করার কতই না চেষ্টা তার। কিন্তু মুনি যেন পণ করেছে বালকের কোনো কিছুকেই ভালো বলবে না সে।

এইতো সেদিন একটা বুড়ো শালিক আটকা পড়েছিল বাড়িতে। ফুফুজান শালিকটার পা দড়ি দিয়ে বেঁধে ছেড়ে দিয়েছিল বালকের ঘরে। সারা দিন সেই শালিকটার সাথে কথা হলো অনেক। শালিককে বালক বলল বুড়ির কথা। ভাবল, এসবে খুশি হবে মুনি। কিন্তু হলো উল্টোটা।

শালিকটা দড়ি দিয়ে বাঁধা দেখে বুড়ির সে কী রাগ। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, 'গাধা, তুলে দেব একটা আছাড় তোকে। পাখি এইভাবে বেঁধে রাখতে হয়? নিষ্ঠুর কোথাকার।'

বকা শুনে চুপটি মেরে গিয়েছিল বালক। অভিমানে কিছুই খাওয়া হয়নি সারা দিন। মুনিটা এমন কেন?

সব সময় টুনটুনি পাখির মতো ছটফট করে, পুকুরে বুড়ো কচ্ছপ ছেড়ে দেয়, কাউকে না জানিয়ে কাশবনে লুকিয়ে থাকে, দুষ্ট ছেলেদের সাথে মারামারি করে ব্যথা পায়। আজব। এই দস্যি মেয়ের সাহস দেখে অবাক হতে হয়!

বালকের এসবের পরও মুনি বুড়িটাকে বড্ড ভালো লাগে। নুন দিয়ে যখন বুড়িটা জলপাই খায়, নরম তুলতুলে মুরগির ছানাকে আদর করে, প্রচণ্ড রোদে সূর্যের আলোর ছটার তলে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে ছড়া আওড়ায়, তখন মুগ্ধ হয় বালক। বালকের বুকের ভেতরটা ভালো লাগার ফড়িং হয়। লাফায় তিড়িংবিড়িং করে। একটু লজ্জা আর একটু ভালো লাগা ঘিরে ধরে তাকে। চোখ বুজে আসে বালকের। বুজে আসে অকালপক্ব চোখ...।

খ.

বৃষ্টির বেগ কমেছে অনেকখানি। শিলও পড়ছে না আর। সোনালি পোকাটির ডানা দুটো ভিজে একাকার। বাইরে বৃষ্টিতে ভিজে আবার মনে হয় আশ্রয় নিয়েছে এই পোকা ঘরেতে।

বালক ঘরে এসে পোকাটা হাতে তুলে নেয়। জোরে জোরে ফুঁ দিয়ে শুকোয় ডানা। তারপর বলে, 'উড়াল দিয়ে খবর নিয়ে আয় তো ডাইনি বুড়িটার। শুনেছি জ্বর অনেক। আমার হয়ে দেখে আয় না ওকে।'

পোকা কথা শোনে না। মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। বালকের ছোট্ট হাতের নরম মুঠোয়...।

পাতার নৌকা

১.

খুকির পায়ে নূপুর ছিল না।

তবু তার রিনিঝিনি শব্দে কাতর সবাই। আধো-আধো অগোছালো কথায় মুখর চারপাশ। মাত্র কয়েকটি শব্দগুচ্ছকে সম্বল করে তার দিন-রাতের পথপাড়ি। দাদ্-দা, মা, ভায়-ই-আ–আরও কত কী! পৃথিবীর সেরা ধ্বনিবিজ্ঞানীও বিভ্রান্ত হবে তার সামনে। এই কান্না, এই হাসি। অবাক হতে হয়।

অনুভূতির এ দুটো শাখা যেন তারই সম্পদ। একমাত্র ভাই হিসেবে সারাক্ষণই থাকতাম লক্ষ্মী ছোট্ট বোনটার পাশে।

কিছুতেই পিছু ছাড়তাম না। মালতি আর চালতা ফুল এনে জড়ো করতাম তার সামনে। তেঁতুলপাতার মুকুট পরিয়ে দিতাম মাথায়। একদিন হালতি পাখি ধরে এনে খাঁচায় পুরে দিতেই তার সে কী কান্না! অবশেষে খাঁচা থেকে মুক্তি দেবার পরই শান্তি।

মাটিতে ছোট্ট গর্ত করে তাতে জল জমিয়েছিলাম। ছোট্ট পুকুর বোনটার।

ভাইবোন মিলে ছেড়েছিলাম করকিনা। দিন ফুরোতেই পটল তুলল সব। খুকির মন ভার। সারা রাত কাটাল না খেয়ে। অনশন।

বড্ড জেদি আর একগুঁয়ে আমার রাজকুমারী বোনটা।

ডিম ফুটে যেদিন বাচ্চা বের হলো হাঁসগুলোর এক-এক করে, সেদিন কী আনন্দ তার! নরম, তুলতুলে ছানাগুলো বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখল সারা দিন। কোলে নিয়ে ঘুরল। এতটুকুনও ক্লান্তি নেই। ছানাগুলোকে খাওয়ানো, ওম দেওয়া–সব যেন তার দায়িত্ব। সাক্ষাৎ এক জননী।

প্রতিদিন রাতে জ্বর আসত বোনটার। আরব্য রজনীর দুষ্ট দৈত্যের মতো আসা রোগটা কী ছিল জানত না কেউ। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যেতেই নির্বাক হতো চপলা খুকি। শরীরে তার রাজ্যির ক্লান্তি।

জ্বরের জন্য প্রার্থনা করে পুকুরপাড়ে পুঁতে দিয়েছিলাম হংসলতা। বড্ড বেশি যত্ন নিতাম। তাড়াতাড়ি ফুল ফুটলেই হবে বোনের রোগমুক্তি। খুকিকে নিয়ে এক দুপুরে পাতার নৌকা ভাসালাম জলে। পাতার পিঠে কয়েকটি ধান, এলোমেলো, ছড়ানো। আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে বললাম, 'করুণাময়, এই নৌকা পৌঁছাক তোমার কাছে। এই ধান উপঢৌকন। এর বিনিময়ে বোনের রোগ ভালো হোক। সুস্থ হোক।' এরপর...।'

ঢাকায় বসে শুনেছি মরে গেছে হংসলতা। ফুল আর ফোটেনি। ডুবেছে পাতার নৌকাটাও। উঠোনজুড়ে খুকির খোঁজে হাঁসের বাচ্চাগুলো

এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়। ছোট্ট পুকুরটি মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। সব শেষ। কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে, ন্যাতানো জীবন।

এই এত সব কষ্ট, এলোমেলোমির মাঝে মেহগনিগাছটা বড় হচ্ছে। গ্রাম ছেড়ে আসার সময় খুকির কবরের পাশে লাগিয়েছিলাম গাছটা। ছোট্ট চারা বড় হয়ে তরতর করে ওপরের দিকে উঠছে। ছুঁয়ে দেবার চেষ্টা করছে আকাশ।

উঠুক, ওপর থেকে ওপরে, একদম মেঘের দেশে। যেখানে আমার রাজকুমারী ঘুমিয়ে আছে, চুপটি করে।

২.

হাওয়ার দেবতা বৃক্ষের প্রবীণ পাতায় বাজিয়ে যায় তানপুরার করুণ সুর।

অশরীরীর আলখাল্লায় নেমে আসে দুধসাদা কুয়াশার নদী। পাতার নৌকায় রাজকুমারীর মৃত্যু দেখে চলে নীরব ক্রন্দন। রুপোর জলে স্রোত কেটে এগিয়ে যায় একটি হংসলতা। ও কি আমার সেই খুকি, ভূমির বুকে হংসলতা হয়ে যার আগমন?

কোথায় যেন ঘণ্টা পড়ে। গায়ের সেই পুরনো স্কুলটায় কি?

আমি কান পেতে শুনি। ঢং ঢং ঢং...।

গুল্লি

বোমায় উড়ে গেছে বাড়িটির এক অংশ।

গোলাগুলি চলছে সমানে। ব্যবহার করা হচ্ছে রিভলবার, কাটা রাইফেল ও মেশিনগান। হকিস্টিক আর ক্রিকেটের ব্যাট কারো কারো হাতে। অনেকগুলো মোটরসাইকেল নিয়ে এসেছে গুন্ডারা। মোটরসাইকেলের ভ্রুউউম, ভ্রুউউম আওয়াজে কানে তালা লাগার জোগাড়।

'বাঁচাওওও। হেল্প মিইই...।' বলে চিৎকার করছে নায়িকা। নায়িকার কষ্ট দেখে হা-হা-হা করে হেসে উঠল প্রধান ভিলেন কবিল। বলল, 'সুন্দরী, তুই এখন আমার। কোথায় তোর লাভার? কেউ আর বাঁচাতে পারবে না তোকে। হা-হা-হা।'

'না। আমার ভালোবাসা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে এই আকাশ, বাতাস, সূর্যকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমাকে বাঁচাতে আমার ভালোবাসার মানুষ আসবেই। আসবেই।' চিৎকার করে বলে নায়িকা। ভিলেন তার কথায় কান দেয় না। ছুরি দিয়ে কেটে ফেলে কাপড়ের কিছু অংশ। নায়িকা কাঁদে। ভিলেন কবিল তার ইজ্জত নষ্ট করে দেবে, এই ভয়ে। নায়িকার পরনে ওপরের দিকে ব্লাউজের মতো রঙচঙে কিছু একটা আর নিচে হাফপ্যান্ট। নাভি চোখে পড়ে। চোখে পড়ে কোমরের মেদ। দর্শক মোটা নায়িকা পছন্দ করে। এই নায়িকা যথেষ্ট মোটা। প্রযোজকদের কাছে তার চাহিদা খুব। মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে প্রতিটি ছবির জন্য। যৌবন চিরদিনের জন্য নয়। এখনই তার কামানোর সময়।

উঁচু একটা দালানের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নামে নায়ক ইজাজ খান। উঁচু থেকে নেমে মাটিতে পা রাখার সাথে সাথে কেঁপে ওঠে চারপাশ। জোরে হাওয়া বইতে থাকে। ভিলেন কবিল ভয় পায়। চিৎকার করে 'অ্যাটাক' বলার সাথে সাথে সব গুন্ডা দৌড়ে যায় নায়কের দিকে।

নায়কের হাতে রামদা। সে সেই রামদা ঘোরাতে থাকে। আঘাত করে একেক জনকে। কারো কবজি উড়ে যায়, কারো আস্ত হাত। ইয়া ঢিশুম,

ঢিশুম বলে নায়ক মারতে থাকে গুন্ডাদের। কবিল গুলি চালায় নায়কের দিকে। নায়কের কাঁধে লাগে। 'নাআআআ...।' বলে চিৎকার করে নায়িকা। নায়ক পড়ে যায় মাটিতে। রক্তে ভেসে যায় তার চারপাশ। কবিল হাসতে থাকে। নায়িকার গালে চুমু খেতে যায়। এমন সময় আবার লাফ দিয়ে ওঠে নায়ক। কাছে থাকা রামদাটা ছুড়ে মারে কবিলের দিকে। রামদার আঘাতে পুরো মাথাটা আলাদা হয়ে যায়। তারপর নায়িকার কাছে যায় নায়ক। হাতের বাঁধন খোলা হয়। নায়িকা ঝাঁপিয়ে পড়ে নায়কের লোমশ বুকে। নায়িকাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে নায়ক ইজাজ খান বলে, 'আমার সাথে লাগতে এলে গুল্লি মেরে খুল্লি উড়িয়ে দেব। হুম।' সাথে সাথে কাট বলে চিৎকার করে পরিচালক।

তালি পড়ে। পরিচালকের মুখে হাসি। এত বড় শট ওকে হয়ে গেল এক টেকে। এনজি শট নেই। শান্তি। দুশ্চিন্তা কাটে পরিচালকের। লাঞ্চ ব্রেক দেয়। ককশিট, ট্রলি, বেবি, সোলার লাইটগুলো নিয়ে রাখা হয় এফডিসির দুই নম্বর ফ্লোরে। সেট ঠিকঠাক করতে লেগে যায় একদল লোক। খাবারের জন্য দৌড়ায় প্রোডাকশন বয়।

রন্টু সব দেখে। এফডিসিতে সে পড়ে আছে আজ মাস দুই হলো। বাবলু নামের এক দালালকে তিনশো টাকা দিয়ে এখানে ঢোকার অনুমতিপত্র পেয়েছে। প্রথমে সে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াত। শুটিং দেখত। সে সিনেমাপাগল। সিনেমার সাথে জড়িত যেকোনো কিছুই তার দেখতে ভালো লাগে। কীভাবে নায়ক পেটায়, কীভাবে আউটডোরে সূর্যের আলো বুঝে ককশিট, রিফ্লেক্টর ব্যবহার করা হয়, কেন ক্যামেরার লেন্স বদলানো হয়, কীভাবে নকল পিস্তল থেকে গুলি ছোটে, কীভাবে রক্ত গড়িয়ে পড়ে শরীর থেকে, কীভাবে মেকআপ দিয়ে চেহারা বদলানো হয়, উইগ পড়ানো হয়–সব কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করত রন্টু। মেকআপম্যান শরীফের একটা অ্যাসিসটেন্টের দরকার ছিল। রন্টুকে একদিন কাজের সময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পছন্দ হয়ে যায় শরীফের। ছেলের চেহারা ভালো। নায়কমার্কা চেহারা। গায়ের রং ফরসা। হাইট ভালো। শুধু বয়স কম। একদম কচি মুখ। লেগে থাকতে হবে। লেগে থাকলে একদিন নায়ক হয়ে যেতে পারে কিংবা সাইড নায়ক। কপালের কথা তো বলা যায় না!

রন্টু শরীফের হয়ে কাজ করে। মেকআপের টুকিটাকি কাজ শিখে নেয়। বেশির ভাগ সময়ই বসে থাকতে হয়।

প্রচণ্ড শীত। নায়িকা ছোট কাপড় পড়ে আছে। রন্টু তাকে গরম কাপড় দেয়। এই নায়িকার কাপড় পরায় বড়ই অনীহা। অভিনয়ের জন্য তার খোলামেলা হতে আপত্তি নেই, এ কথা বলে এর মাঝেই মিডিয়ায় আলোড়ন তুলেছে নতুন নায়িকা মিশিতা। তার দেমাগ দেখার মতো!

রন্টুকে মিশিতা পছন্দ করে। চেহারা ভালো লোকজন তার পছন্দের। সুন্দর কিছু পাশে থাকলে মন ভালো থাকে। রন্টুর বয়স কম। কমবয়সী ছেলের সামনে লজ্জা নেই। মিশিতা কাপড় বদলানো থেকে বগল-নাকের লোম সাফ করা সব রন্টুর সামনেই করে। ছেলের লোভ আছে তবে ভিতু। মেয়েরা চোখ দেখেই সব বোঝে। রন্টু তাই নিরাপদ।

নায়ক ইজাজ খান এসে ঢোকে নায়িকার ড্রেসিংরুমে। একসাথে খাবে। তারা মেপে মেপে খায়। শরীরের খেয়াল রাখতে হয়। সকালে দুটো পরোটা, সুজির হালুয়া, ডাল আর কমলার জুস। দুপুরে বেশি খাওয়া হয়। এফডিসির খাবারের অনেক সুনাম। কালা ভুনা, দশ-বারো রকমের ভর্তা, কবুতরের মাংস আর ডাবের পানি–এই হলো নায়কের খাবার। মিশিতাও খায়। শরীর মোটা রাখতে হয়। কোমরের ভাঁজ দেখাতে হয় সিনেমা হলে, নইলে দর্শকদের শিস দিতে শোনা যায় না।

মিশিতা আর ইজাজ খান যখন খায়, তখন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয় রন্টু। এ সময় কেউ ভেতরে ঢুকতে পারে না। আদর-সোহাগের পর্ব চলে। রন্টু ইজাজ খানের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে। তার কল্পনাশক্তি প্রবল। রন্টুর নায়ক হবার ইচ্ছে। ভিলেনের কলার ধরে বলার ইচ্ছে, 'লাগতে এলে গুল্লি মেরে খুল্লি উড়িয়ে দেব। হুম।' একদিন না একদিন সে অভিনয় করবেই। ওস্তাদ শরীফ বলেছে তাকে সুযোগ করে দেবে। দীর্ঘদিন ধরে সে আছে ইন্ডাস্ট্রিতে। তার কথা পরিচালক ফেলতে পারবে না। প্রথমে নায়কের পেছনের সারিতে কোথাও দাঁড়াতে হবে। নায়কের একদম আশপাশে সুন্দর চেহারার কারো দাঁড়াবার নিয়ম নেই। যোগ্যতা থাকলে রন্টু ভিড়ের মাঝে থেকেও একদিন নিজের জাত চিনিয়ে দেবে। নায়ক হতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। এত সহজে সবকিছু হয় না। ইজাজ খানেরও হয়নি। এই সব উঠে আসার গল্প আর স্বপ্ন রন্টুকে

আশাবাদী করে তোলে। রন্টু সেই একদিনের জন্য আশাবাদী হয়ে ওঠে। ঢিশুম-ঢুশুম প্র্যাকটিস চালিয়ে যায়। নিজের ঘরে হিরো, হিরোইনের পোস্টার টানিয়ে রাখে। মানিব্যাগে থাকে ভিউকার্ড। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করে। চায়নিজ মোবাইলটায় এমপি ফোর গান থাকে। গানের দৃশ্য দেখে একটু-আধটু নাচের চেষ্টাও চলে।

মাস শেষে হাজার দুই টাকা তার হাতে তুলে দেয় ওস্তাদ শরীফ। কৃতজ্ঞতায় মাথা নিচু হয়ে আসে রন্টুর। না হলেও চলত এমন ভাব করে টাকাটা নেয় সে। আসা-যাওয়া, খাওয়া এসবের খরচ উঠে আসে। শুটিং প্যাকআপ হবারও অনেক পরে বাসায় ফেরে রন্টু। বাসা তার ভালো লাগে না। সিনেমার এই রঙিন জগৎই তার ভালো লাগার, ভালোবাসার জায়গা। এখানেই শান্তি। বাসায় যত কষ্ট।

মোহাম্মদপুর থেকে বসিলা হয়ে আরো ভেতরে তার বাড়ি। বাবার ফার্নিচারের দোকান ছিল। কাঠের কাজ করত। তার দাদার সময় এই ব্যবসা জমজমাট ছিল। সে সময় সাড়ে তিন শতাংশ জমি কিনে রাখা হয় বসিলায়। জমির দাম কম ছিল। এদিকটায় কেউ আসত না। অপরাধীদের আখড়া ছিল এই এলাকা। জমির দাম এরপর হু হু করে বাড়তে থাকে। রন্টুর বাবা আর তার একমাত্র ভাই বাবার ব্যবসা নিয়ে খুব একটা এগোতে পারেনি। লসের পর লস। দুই ভাইয়ের বিয়ের পরপরই বিবাদ শুরু হয়। হাতাহাতি হয়। জমিজমার ভাগ নিয়ে লড়াই হয়। রন্টুর চাচির বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল। বিয়ের পর যে টাকা পায় রন্টুর চাচা, তাই দিয়ে জমিটা কিনে নেয় সে। নগদ টাকার লোভ সামলাতে পারেনি রন্টুর বাবা। জমিটা ছেড়ে দিয়ে নতুন স্বপ্ন নিয়ে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করে। মাথায় ব্যবসার ভূত। না বুঝেই অনেকগুলো টাকা খাটানো। ব্যবসা বন্ধ হয় অল্প কিছুদিনের ভেতরেই। রন্টুর বাবা অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে কাটায় দিন। রন্টু পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। তার পড়তে ভালো লাগে না। সিনেমা টানে। পরিবারের দায়িত্ব নিতে ভালো লাগে না। মায়ের কান্না, বাবার অসুস্থতা বিরক্ত লাগে।

তার চাচা ধনী হয়ে ওঠে। সচিবালয়ে চাকরি হয়। গাড়ির ড্রাইভার। অনেক ফাঁকফোকর। এদিক-ওদিক দিয়ে টাকা আসতে থাকে। বসিলায়

বাড়ি করে ভাড়া দেয়। টাকার কমতি নেই। তার ছেলেমেয়েগুলোও মানুষ হয়।

রন্টুর বড় ভাই সংসার দেখে। কাপড় সেলাই করে তার মা কিছু আয় করে। বড় ভাই বাড়িতে বাড়িতে নেটের লাইন পৌঁছায়। ব্রডব্যান্ড নেট। এ দিয়ে খুব একটা আয় হয় না। কীভাবে বাড়তি টাকা রন্টুর বড় ভাইয়ের মাধ্যমে আসে, তা বুঝে উঠতে পারে না সে। টাকা আয় করা এতই সহজ?

বাবার চিকিৎসা বন্ধ। পরে রন্টুর বড় ভাই মনে করল এই বিলাসিতার মানে নেই। চিকিৎসা করে লাভ হবে না। আজকাল আর চিকিৎসা হয় না। বাড়ির কাছে হোমিওপ্যাথের ডাক্তার আছে। অবস্থা বেশি খারাপ হলে সেখানে যায় রন্টুর মা। স্বামীকে এখনো ভালোবাসে সে। স্বামী সুস্থ হোক এটা চায়। দুই ছেলে যাতে বাবার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এ জন্য গজগজ করে। মাস শেষে সংসার চালানোর টাকায় কম পড়লে চাচার কাছে যেতে হয়। রন্টু যায়। তার চাচা অপমান করে। বাঁকা বাঁকা কথা বলে। তবে সাহায্য যে করে না তা নয়। মাঝে মাঝে টাকা দেয় কিছু।

বসিলায় টায়ারের গন্ধ। দম বন্ধ হয়ে আসে। শীত পড়েছে জাঁকিয়ে। কাল সিনেমা হলে যাওয়া হবে। এক টিকিটে দুই ছবি। শেষের ছবিটা আপত্তিকর ইংরেজি ছবি। বাজে দৃশ্য থাকে খুব। এই ছবিটায় ভিড় হয় বেশি। দর্শক আগ্রহ নিয়ে পুরো ছবি দেখে। পারলে চোখ, মাথা, মুখ পুরো দেহ অতি আগ্রহের কারণে স্ক্রিনের ভেতর ঢুকে যায়। এসবও একদম মন্দ লাগে না রন্টুর।

বাড়ি ফেরে রন্টু। বাড়িতে তালা দেওয়া। বড় ভাইকে কল দেওয়া হয়। রিং হয়। ফোন ধরে না কেউ। বসিলায় ছোট্ট একটা টিনের বাড়ি ভাড়া করে থাকে তারা।

রন্টু চিন্তায় পড়ে যায়। মায়ের কোনো খবর নেই। বাবাও নেই। পাশের বাড়ি থেকে জানা যায়, রন্টুর বাবার অবস্থা খুব খারাপ। রন্টু আসার কিছুক্ষণ আগে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। আজ দুপুরের পর আচমকা খাট থেকে পড়ে জ্ঞান হারায় রন্টুর বাবা। মুখ থেকে ফেনা বের হয়ে বিচ্ছিরি অবস্থা। রন্টুর মা কয়েকজন প্রতিবেশীর সাহায্য নিয়ে তাড়াহুড়ো করে হাসপাতালে নিয়ে যায় লোকটাকে। রন্টুর বড় ভাইকে জানানো হয়। রন্টুকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি কেউ। রন্টু তার পরিবারে এত প্রয়োজনীয় কেউ না।

ভাই মোবাইল ধরছে না। হয়তো ব্যস্ত এই মুহূর্তে বাবাকে নিয়ে। রন্টু দ্রুত ছুটে যায় হাসপাতালে। হাসপাতাল কাছেই। গিয়ে জানতে পারে বাবা তার ক্রিটিক্যাল কেয়ার সেন্টারে আছে। মা কাঁদছে। বড় ভাই মন ভার করে হাঁটছে হাসপাতালের করিডরে। চোখ ঝাপসা তার জলে। বাবাটা তাদের খারাপ না। পরাজিত একজন মানুষ সন্দেহ নেই, তাতে কিন্তু তাদের প্রতি ভালোবাসায় কোনো দিন কমতি রাখেনি। যখন যা চেয়েছে, তা দিতে পারেনি। কিন্তু সুযোগ পেলেই বুকে জড়িয়ে ধরে দোয়া করেছে। দীর্ঘদিন ধরে ঘরে ফার্নিচার পরে থাকলেও মায়া লাগে আর এ তো বাবা!

রন্টু গিয়ে বড় ভাইয়ের পাশে দাঁড়ায়। বড় ভাইয়ের দিতে তাকায়।

'অবস্থা ভালো না। টিকবো না মনে হয় আর। কিডনি নাই।' রন্টুর ভাই বলে।

'হুঁশ আছে?'

'নাই। টাকা লাগবো। কাইলকার মাঝে।' মাথা নিচু করে বলে রন্টুর ভাই। তাকে খুব অসহায় মনে হয়।

'কী করবা?'

'আমি বাড়তি টাকা কই দিয়া আনি জানস?'

'না।'

'নেট-এর বিজনেস। নেট-এর লাইন দেই ঘরে ঘরে। একদিনে যেই লাইন দেওয়া যায়, অইটা দেই সাত দিনে। বাড়িতে কয়জন লোক দেখি। খোঁজখবর নেই কে কখন বাইরে যায়, ঘরে আসে। তারপর সুযোগ বুইজা তিনজনের টিম লইয়া ডাকাতি করি। টাকা আসে অইখান দিয়া।'

রন্টু তার ভাইয়ের কথা অবাক হয়ে শোনে। সিনেমার মতো মনে হয় সবকিছু। এই নিয়া ছবি বানাইলে হিট হইত। সুপারহিট। ব্লাকেও টিকিট পাওয়া যেত না। শুধু নায়িকা মিশিতাকে নিতে হতো।

'কী এইগুলো?'

'টাকা কামানো সহজ নারে ভাই। কষ্ট আছে। এক এলাকায় বেশি ডাকাতি করণ যায় না। রিস্ক। বিনিয়োগ লাগে। মেশিন কিনতে হয়। ছুরিছারা দিয়া হয় না।'

'এই কতা এহন ক্যান?' বাবার অসুস্থতার সময় রন্টুর বড় ভাইয়ের মুখে এ কথা ভালো লাগে না।

‘চাচার বাড়ির নেট নষ্ট। লাইন দিতে যামু তুই আর আমি। চাচার আলমারিতে অনেক টাকা। বাবার চিকিৎসায় কাজে লাগবে। বাবার জন্য করলে তোর পাপ হবে না। যহন যামু, তহন বাড়িতে খালি চাচাই থাকবো।’ কথাটা বলে রন্টুর বড় ভাই সিগারেট খাবার জন্য হাসপাতালের কাছের দোকানটায় যায়। রন্টু বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায়। কাছেই কোন এক বেডের কোন এক রোগী মারা গেছে। তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে কাছের মানুষরা। কী কষ্ট!

বাবাকে বাঁচাতে হবে। যেকোনো কিছুর বিনিময়ে রন্টু বাবাকে বাঁচাবে। সিনেমার নায়করা তো তাই করে, তাই না?

২.

নায়ক হবার স্বপ্ন পূরণ হবে না রন্টুর।

হাতে তাদের সর্বমোট সাতশো একান্ন টাকা আর পাঁচশো টাকার দুইটা প্রাইজবন্ড। দুই ভাই পালাচ্ছে।

আকাশে মস্ত বড় চাঁদ। শীতে কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে পৃথিবীর শরীর। চাঁদের আলোর আঁচল আর কুয়াশার মাঝ থেকে দুই হাত দূরের কাউকেও ঠাওর করা যায় না। পালাতে সুবিধা হয়। রন্টু আর বড় ভাই পালায়। অন্ধকারের ভেতর, কুয়াশার ভেতর।

পেছনে মানুষের আওয়াজ শোনা যায়। ধরতে পারলেই গণধোলাই, নইলে পাঠানো হবে জেলে। চাচাকে মারার পর পালানো গেল না সময়মতো। গলায় ছুরি বসানোর সময় চিৎকার করে লোক জড়ো করার চেষ্টা করেছে লোকটা। ছুরি রন্টুই চালিয়েছে। গলায় পোচ দেবার সময় বলেছে নায়কের মতো, ‘লাগতে আসবি না। এলে গুল্লি মেরে খুল্লি উড়িয়ে দেবো।’ দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো আরকি!

এ সময় ভাই আলমারি ভেঙেছে। ভেঙে হতাশ হয়েছে। লাখ লাখ টাকার বদলে পাওয়া গেছে অল্প কিছু টাকা আর প্রাইজবন্ড।

রন্টু দৌড়ায়। বড় ভাই কই খেয়াল নেই। কুয়াশার ভেতর পথ না বুঝেই দৌড়ায়। নায়ক হওয়ার স্বপ্ন ভাঙল বলে এই মুহূর্তে তার একটু মন খারাপ। বাবাকে বাঁচানোও হলো না। আফসোস।

কুয়াশার চাদর ছিঁড়ে মাঝে মাঝে চাঁদটা উঁকি দেয়। লুকোচুরি খেলা। চাঁদের দুধসাদা আলো দেখে মিশিতার কথা মনে পড়ে। কী সুন্দর গায়ের রং! কী সুন্দর শরীর! নরম, পেলব।

মিশিতার জন্য রন্টুর মন উচাটন হয়। কান্না আসে। সে কি মিশিতাকে ভালোবাসে?

হুম, বাসে।

আলপিনে কুয়াশা

ইকড়ি মিকড়ি রোদ

শৈশব

'এই আকাশটা এমন যদি হতো,
জল ঝরিয়ে কাঁদত আমার মতো।'

আকাশটা নিশ্চুপ হয়ে থাকে। নীল বুকের কোলে জড়িয়ে ধরে রাখে সাদা সাদা কচি মেঘ। সেই মেঘকে আমার অনেক কিছু বলার আছে।

দুপুর হলে বাতাসে বিছানো থাকে রোদের কার্পেট। সূর্যটা ফোটায় সোনালি আলোর ফুল। বুলবুলি, দোয়েল আর টুনটুনি উড়ে বেড়ায়। ইরি ধান কেটে বাড়ি ফেরে চাষিরা। মস্ত জলপরানি নদীর জলে ভেসে বেড়ায় অসংখ্য নৌকা। গাছের পাতায়, রোদের আড়ালে ইকরি-মিকরি ছায়া খেলা করে। এ এক দেখার মতো দৃশ্য! দেখি। মনে পড়ে শৈশবের গ্রামটার কথা। কত রাত, কত দিনের স্মৃতি জড়ানো এর শরীরে। স্মৃতিগুলো ছবি হয়। মাথাতে আসে আর যায়। অজস্র সাদা-কালো ছবি। ক্যামেরায় ফ্লাশ পড়ে। একটার পর একটা। কষ্ট হয়। বড্ড কান্না পায়। উফ্, কী যন্ত্রণা! আকাশ, তুই আমার মতো করে কাঁদ। জল ঝরিয়ে যা ইচ্ছে মতো।

কৈশোর

চট্টগ্রামের জিইসি মোড়ে আড্ডা। থাকি টাইগারপাস এলাকায়। বাড়ির কাছেই পাহাড়। পড়াশোনার জন্য আসা। কবিতা লেখার জন্য প্রায়ই ছুটে যাই পাহাড়ে। লেখা হয় না। নাগাল পাই না কোনো জুতসই শব্দের। শৈশবের গ্রাম থেকে এ এলাকার বিস্তর তফাত। প্রথম কাছ থেকে নগর দেখা। মন্দ নয়। এ সময়েই মেয়েটি পালিয়ে আসে। আমার জন্য। কাউকে কিছু না বলে।

সন্তোষপুর গ্রামে আমাদের বাড়ির পাশেই থাকত। হুট করেই এক সন্ধ্যায় হাজির আমার মেসে। চোখের দিকে তাকাতেই বুঝলাম এই চোখ কেঁদেছে অনেকক্ষণ। মেয়েটা কান্না লুকিয়ে হাসি-হাসি মুখ করে বলল,

'অবশেষে চলেই আসলাম। বাড়িতে বিয়ের আয়োজন চলছে। বরের চেহারা ভালো না। বর খুঁজতে শহরে চলে আসছি। রাজপুত্তুর লাগবে। তুই সাহায্য করবি রাজপুত্তুর খুঁজতে?'

সেদিন কিছু বলিনি। বুঝেছি এই মেয়ে ভালোবাসে আমাকে। পাগলের মতো। অবাক হয়েছিলাম বোকা মেয়ের কাণ্ড দেখে। এই ছিল ওর মনে কে জানত!

তারপর শুধু ক্লাস ফাঁকি দেওয়া। একটা সপ্তাহ। হোটেল নিরিবিলিতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করা। পুরি, নিমকি চিবানো। কৈশোরের প্রেম বড্ড ভয়ংকর। বড় বেশি আবেগ থাকে এর পরতে পরতে। আবেগের শেষে বাস্তবতার জালে পড়ে মেয়েটাকে ফিরে যেতে হয় একদিন। এটাই নিয়ম।

আহারে, চলে যাবার দিনে কী কান্না মেয়েটার! আমি নিরুপায়। থামাতে পারিনি। অতটুকুন ক্ষমতা নেই। কৈশোর, তুই এত ক্ষমতাহীন কেন? তোকে আমি কোনো দিন ক্ষমা করব না। কতশত বিষাদ মাখানো ছবি। ক্যামেরায় আবার ফ্লাশ পড়তে থাকে। চলে যায় ছবি। একটার পর একটা। কুয়াশা হয়ে।

যৌবন

এ শহর বড় অদ্ভুত। বুননে জড়ানো স্বার্থপরতা। আমি ঢাকায়। নতুন জীবন। এক বন্ধুর বাড়ির চিলেকোঠায় বসবাস। চিলেকোঠার সেপাই। দিনে তিনটি করে টিউশনি। বাড়িতে পাঠাতে হবে টাকা। চারপাশে শুধু অভাব। প্রায় দিনই কৌটার তলানিতে পড়ে থাকা চুপসে যাওয়া মুড়ি আর রং চা খেয়ে কাটাতে হয়। কখনো কখনো কিছুই থাকে না।

উপোস থেকে ছাদে বসে গাই গান। শোনা যায় মন্দিরার টুংটাং শব্দ। পুরনো কথা মনে পড়ে। খুব বেশি।

এ সময়টায় গ্রামে কালবোশেখি হতো। নদীতে থাকত পাহাড়সমান ঢেউ। মাছ ধরার হিড়িক। মায়ের হাতে বানানো পিঠা আর কৈশোরের বোকা মেয়েটির কাঁদো-কাঁদো মুখ। সব যেন ঝাপসা এখন। বড় বেশি না ভালো লাগার মাঝে বসবাস আমার। অযথা স্মৃতিগুলোকে নিয়ে বসে থাকা। সযতনে রেখে শুধুই বেঁচে থাকা। তারপর, তবু ক্যামেরায় ফ্লাশ পড়ে বারবার। ক্লিক...।

জননী ও আমি কথন

দৃশ্যপট: বালক

'দিন ফুরোলেই শুরু আমার দৈত্যি দানোর ভয়,
মাগো আমায় ঘুম পাড়িয়ে একলা জেগে রয়।'

মাগো, অমন চুপটি করে শুয়ে আছ কেন? তোমার হাসিটা তো কখনো এত নিস্প্রাণ ছিল না। তুমি মৃত্যুভয়ে কাতর হওনি কখনো। তবে কেন এ ছন্দপতনের ইতিহাস?

আস্ত রাতটা বারান্দায় দাঁড়ানো আমি। একা একা। কতবার ভয় পেয়েছি। মাঝখানে ঘুমিয়েও পড়েছিলাম। স্বপ্নে তোমাকে দেখেছি। তুমি আমার পাশে শুয়ে চাঁদমামার গল্প বলছ, ভূতের গল্প বলছ আর আমি ঘুমে ঢুলুঢুলু হয়ে শুনছি। ভূতের কথা শুনে ভয় পেতেই আমার এই এতটুকুন শরীরটা তোমার বুকের জমিনটায় লুকিয়ে ফেলছ। বলছ, 'ভয় নেই বাবা। ভয় নেই।' প্রগাঢ় মমতায় চুমু খাচ্ছ সন্তানের কপালে। সন্তানের ভয় কাটানোর জন্য। মঙ্গল কামনার জন্য।

মা তুমি তো ছিলে পাশেই। তবু তোমায় ছোঁয়া যাচ্ছিল না। আবছায়া ধোঁয়ার মতো একটা দেহ। ধরতে গেলেই নাই হয়ে যায়। ছায়া মনে হয়। শুধুই ছায়া। ধরণীর সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের তলে জন্ম নেওয়া এক টুকরো পবিত্র ছায়া। মা তুমি আমায় ছুঁয়ে দিলে। আমি ঠিকঠিক টের পেয়েছি। তোমার ছায়ার ছোঁয়া এত মিষ্টি কেন?

রাত শেষে দিন হয়। দিনের আলো ফোটে। পাখির পিঠে সওয়ার হয়ে আসে সকালের নিশ্চুপ আলো। এ আলো অন্য রকম। রাতের অবশেষ আঁধার থাকে এর পরতে পরতে। দারুণ। অপূর্ব।

সামান্য এক সকাল নিয়ে কেন এত মাতামাতি করছি, জানো? কারণ এ আমার প্রথম রাত জাগার শেষে এক পরিপূর্ণ সকাল। সদ্য আঁধারের আঁতুড়ঘর থেকে বের হওয়া একটা কমবয়সী সকাল। দীর্ঘ রজনী শেষে এক টুকরো ভোর।

চারপাশে আমার অনেক মানুষ। তবু কেউ নেই যেন। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। অভিমান হচ্ছে মায়ের ওপর। কান্নায় ফেটে যাচ্ছে বুক। কিন্তু আমি কাঁদব না। ছোট বলে কি সব সময় কাঁদতে হবে আমাকে? মা কি জানে না যে আমি খিদে সহ্য করতে পারি না!

আমাকে নিয়ে না ভেবে নিথর হয়ে শুয়ে আছে হাসপাতালের বিছানায়। স্বার্থপর। স্ট্রেচারে করে আজ মাকে যখন নিয়ে আসা হচ্ছিল, তখন আমি পেছন পেছন দৌড়াচ্ছি। থাকার চেষ্টা করেছি মায়ের পাশে। ছোট ছোট পা নিয়ে পেরে উঠিনি বড়দের সাথে। ভিড়ভাট্টার গুঁতো আমায় দূরে ঠেলে দিয়েছে। সবাই ভুলে ছিল আমাকে। মা, তুমিও কি আমায় ভুলে গেলে? রাগ হয়।

তুমি তো তোমার বাচ্চাটাকে ভুলতে পারো না। কেন চুপচাপ তুমি? আর ভাল্লাগে না মা। তোমার এই অবহেলা ভাল্লাগে না।

দৃশ্যপট: জননী

তোকে ছাড়া ভালো নেই রে সোনা। জানিস, আমি নক্ষত্র হয়েছি। এখান থেকে প্রতি রাতে বরফের কুচির মতো আলো ঢালি তোর শরীরে। টের পাস?

বড় হয়ে যাচ্ছিস তুই। শরীরের প্রতি খেয়াল রাখবি। বড্ড অনিয়ম করিস।

আমার কথা মনে হলেই বের হবি বাইরে। তাকিয়ে থাকবি একটানা আকাশের দিকে। কোনো এক ফাঁকে কান্না-কান্না মেঘে ভিজিয়ে দিয়ে যাব আমি তোকে। ঠিক আছে?

রাত হলে এখনো ভয় পাস বোকা? কাঁদবি না। এই তো আমি আছি। তোর একদম পাশে। তোর মা।

দিনলিপি-রাতলিপি

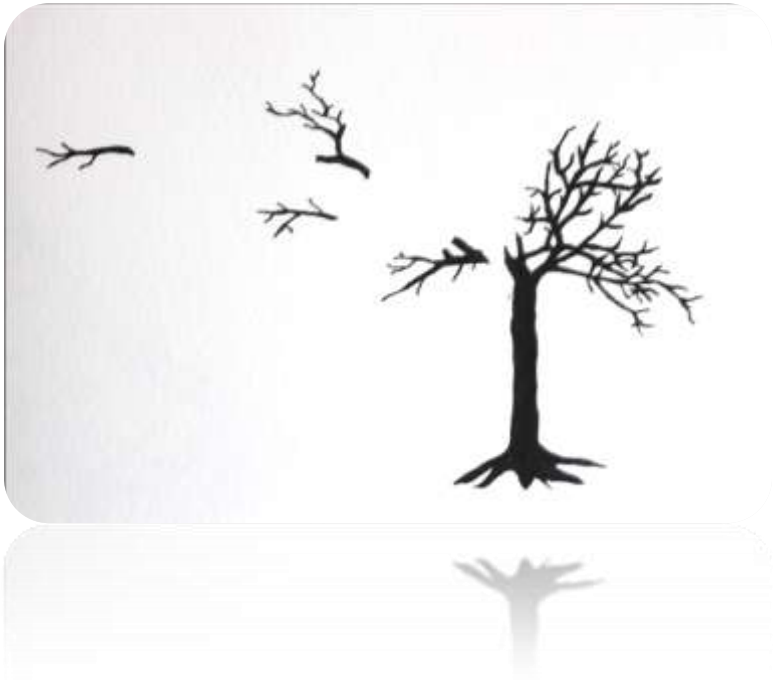

তারাদের পথে

ক্ষিতিশ জেঠু কাঠের কাজ করতেন। হাতের জাদুকরি ছোঁয়ায় তৈরি করতেন কাঠের আসবাবপত্র। খাট, চেয়ার, টি-টেবিল আরো কত কী!

চৌপর দিন কাজ আর কাজ। এত কাজ করেও লোকটা আয় তেমন করতে পারতেন না। গরিব লোকটার জন্য আমাদের জমিতে বাবা ছোট্ট একটা ঘর তুলে দিয়েছিলেন। দেশলাই বাক্সের মতো ছোট্ট একটা ঘর। থাকতে দেবার শর্ত হলো কাঠের কাজ করবার ফাঁকে যদি অবসর মেলে তবে আমাদের বাড়ির দেখাশোনা করতে হবে। কাজটা তিনি ভালোভাবেই করতেন। ফাঁকিবাজ নন।

স্ত্রীকে হারিয়েছিলেন জেঠু। সাত বছর বয়সী একটা মেয়েকে নিয়েই তার জীবন। আমি জেঠুর সাথেই থাকতাম। থাকতে চাইতাম। তার সাথেই আমার যতশত গল্প। পাশে বসে মুগ্ধ হয়ে তার কাঠের কাজ দেখতাম। মা বকতেন। বলতেন, 'লাটে উঠল পড়াশোনা। এবার গায়ে হাত তুলতে হবে। মার না পড়লে ঠিক হবে না এই ছেলে।' মায়ের কথা, ভয় দেখানো থোড়াই কেয়ার করতাম। জানি, মা আমাকে খুব খুব ভালোবাসেন। ওই ছোট বয়সেই বুঝে গিয়েছিলাম, যারা ভালোবাসে খুব, তাদের কথা খুব একটা মানতে নেই।

পুজো এলেই জেঠুর সাথে যেতাম মণ্ডপে। আমায় কাঁধে করে নিয়ে যেতেন। মুঠোভর্তি মিষ্টি, বাতাসা নিয়ে বাড়ি ফিরতাম। প্রায়ই আয়োজন করে মাছ ধরা হতো বাড়ির পুকুরটায়। জাল মেরামত করে জেঠু নেমে পড়তেন গলাপানিতে। কলার ভেলায় চড়ে আমিও দাপাদাপি করতাম। রুপোলি মাছগুলো যখন আটকা পড়ত জালে, কী আনন্দই না হতো!

বাবার বদলির চাকরি। পুরনো শহরটাকে পেছনে ফেলে পা রেখেছিলাম রাজধানীতে। নতুন জীবন, ছোট্ট আমার বড় হয়ে উঠে রাজ্যির ব্যস্ততা। প্রথম দিকে চিঠি চালাচালি হলেও একসময় মলিন হলো ক্ষিতিশ জেঠুর মুখ। সে এখন কোথায় আছে, কেমন আছে জানা নেই। কী এক কারণে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বাবা জেঠুকে। জানি না। জেঠুর চলে যাবার কারণ জানতে পারিনি।

আমাকে একটা অদ্ভুত জিনিস শিখিয়েছিলেন তিনি। মন খারাপ হলেই জেঠু পেনসিল ব্যাটারির টর্চটা নিয়ে আসতেন। তারপর গভীর অন্ধকারে

আকাশভর্তি তারাদের দিকে তাক করে আলো ছুড়তেন। পেনসিল ব্যাটারির টর্চলাইটটার ক্ষমতা সামান্য। আলোর রেখা কিছুদূর গিয়েই তাই থেমে যেত এক জায়গায়। জেঠু বলতেন, ওই থেমে যাওয়া অংশ থেকেই উঠে যেতে হয় তারাদের দেশে। সেখানে গেলেই মন ভালো হয়ে যায়। জেঠু নেই, তবু আমি টর্চটা ছাড়তে পারিনি। ব্যস্ত শহরে যখন রাত নামে বিষণ্ন মনে, তখন ছাদে উঠে যাই। আলো ফেলি তারাদের পথে। আমার মন খারাপের আলো। বড্ড বেশি মন খারাপ। এই কষ্ট-কষ্ট আলো কি দেখা যায়? জেঠু দেখতে পান?

আঁধারের ফুল

মাঝরাত। ঢাউস আকাশে তারাদের ছিটেফোঁটাও নেই।

মাঝেমধ্যে আলোকিত হয়ে উঠছে চারপাশ। বজ্রপাত। মনে হচ্ছে কে যেন আকাশের আড়াল থেকে আতশবাজি পোড়াচ্ছে। ফুঁসে উঠছে নদীর জল। নৌকাগুলোয় কুপি জ্বালানো। আঁধারে আলোর ছোট ছোট বিন্দু। আলোর ফুল হয়ে ফুটে রয়েছে।

বড় বড় ঢেউ। জল জেলে নৌকাগুলোকে আকাশে ছুড়ে দিয়ে আবার লুফে নিচ্ছে। এগুলো সব লঞ্চের গা ঘেঁষে ছিল। স্রোতের টানে সরে গিয়েছে দূরে।

মাঝরাতের এই ঝড়ে জেগে উঠেছে লোকজন। ডেকে কয়েকজন আজান দিচ্ছে। শোনা যায় শিশু আর নারীদের কান্নাকাটি। আর্তচিৎকার।

কেবিন থেকে বের হলাম। দাঁড়িয়ে রইলাম রেলিং ধরে। ভয়ে ঘুম আসছে না। ছুটিতে যাচ্ছি বাড়ি। এমন বিপদে পড়ব ভাবিনি। স্রোতের সাথে যুদ্ধ করে ক্লান্ত ইঞ্জিন। আচমকা বাতাসের ঝাপটায় কাত হয়ে গেল লঞ্চটা। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার শুরু হলো। প্রচণ্ড বাতাস। ঢেউয়ের ক্ষোভ বাড়ছে। ডেকের লোকজনদের তালাবদ্ধ করে রাখা হলো।

চারপাশের সব ওলটপালট হয়ে আছে। ভয়াবহ দুর্বিপাক। একটু পরপরই বজ্রপাতের কারণে চারপাশটা আলোকিত হলে পাড় দেখবার জন্য তাকাই। আশাহত হতে হয়। পাড়ের কোনো চিহ্ন নেই। দমে যাই।

একটা সময় থামে বাতাসের পাগলামি। বেয়ারা ঢেউগুলো পোষ মানে। শান্ত হয়।

আঁধার কাটেনি। কেবিনে ফিরে যায় লোকজন। একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ে ডেকের লোকগুলো। চুপচাপ সব। নীরব, নির্জন।

আমি রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। ভয় কাটেনি। ঝড়ের পরে ভালো করে খেয়াল করে দেখলাম, দূরের কয়েকটি আলোর বিন্দু নিভে গেছে। কেউ তা খেয়াল করেনি। হয়তো নদী ওদের নিয়ে নিয়েছে। গিলে খেয়েছে।

এই অবহেলিত মানুষগুলো খবর কেউ রাখে না। ওরা নিখোঁজ হলে বিচলিত হবার কিছু নেই। অভাগা জেলেগুলো এভাবেই বেঁচে থাকে। আঁধারে আলোর ফুল হয়ে বেঁচে থাকে সারা জীবন।

রংধনু

আচমকা একদিন পৃথিবীতে আছড়ে পড়ে মেঘ। শহরের অলিগলি পেরিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের চূড়ায়। হুড খোলা রিকশার পর্দায় আর বর্ষাতিতে। রাস্তায় ভিজে ভিজে কাপড় বলের মতো করে পেঁচিয়ে ফুটবল খেলে টোকাইরা। পথের খানাখন্দে জল জমে। সেখানে এসে ভিড় করে সোনালি রোদ। এতটুকুন নিয়েই আমার শৈশব থেকে কৈশোরের বৃষ্টি। তাই দিনের পর দিন দেখতে দেখতে আলাদা আর কোনো আবেদন নেই এর।

বন্ধু তমাল। দুজনেই শহরের ছেলে। একই এলাকায় বড় হয়েছি। সব কাজ-অকাজ গলাগলি ধরে করি, করেছি একসাথে। গোপনে রিকশার চাকার হাওয়া ছেড়ে দেওয়া, শৈশবে স্কুল পালানো, বাজি ধরে ক্রিকেট খেলা, কত কিছুই না করেছি!

তমাল বৃষ্টিবিলাসী। ও এমন কেন বুঝি না। হতচ্ছাড়াটা দিগ্বিদিক ঘুরে বেড়ায় বৃষ্টির জন্য। ও নাকি বৃষ্টির ঘ্রাণ পায়। বৃষ্টিপাগল ছেলেটা বলে, বৃষ্টির ঘ্রাণ নাকি একেক জায়গায় একেক রকম। সবাই এ নিয়ে খেপালে বলে, 'তোরা এমন করিস ক্যান? আমি বৃষ্টিমানব। বৃষ্টির দিনে জন্ম, তাই এটার জন্য মন পোড়ে।' ওর কথা শুনে হাসি আমরা।

ক্যাম্পাসে চিড়ার মোয়া বিক্রি করে করুণা নামের একটি মেয়ে। তমালের সাথে মস্ত খাতির। সারা দিন টুকুর টুকুর করে গল্প করে ওরা। যেন দুই বন্ধু, পিঠেপিঠি ভাইবোন। করুণার কাছে তমাল জানতে পারে, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর বৃষ্টি নাকি হয় ভাসানচরে। মাঝে মাঝে দেখা যায় রংধনু। এই অল্প জীবনে রংধনু দেখা হয়নি তমালের। প্রতিবারই কোনো-না-কোনো অঘটন। আফসোস।

একদিন দুপুরে হুট করে রুমে আগমন। একগাল হেসে বলল, 'চল, ভাসানচরে রংধনুটা দেখে আসি এবার। কোনো অঘটন চাই না আর। রংধনু দেখতেই হবে যেভাবে হোক।

আমি অবাক। বলে কি গাধা! কদিন পর পরীক্ষা। ফাঁকি দিতে দিতে পড়াশোনার অবস্থা যাচ্ছেতাই একদম। আমি সাফ না করলাম। বললাম, 'গো টু হেল। উল্টাপাল্টা শুনতে চাই না পরীক্ষার আগে। শুনতে চাই না আজগুবি কথা।' তমাল কি কথা শোনার ছেলে! বলল, 'অতশত বুঝি না। কালই যাচ্ছি। তুই যাবি সাথে। ডান।'

ধোপে টিকল না আমার আপত্তি। কখনোই টেকে না। মুখ ভার করে রওনা দিলাম ভাসানচর। অবশ্য কিছুটা লোভ আমার আছে। ওখানকার গায়ক হাবি পাগলার কথা শুনেছি অনেক। বৃষ্টি না টানলেও গান টানে আমাকে দারুণভাবে। এ সুযোগ তাই হেলায় হারাতে চাই না।

ঝটিকা সফর। ভাসানচর সৌন্দর্যের আঁধার। চারদিকে সবুজ আর সবুজ। পুরো চরটার গা ঘেঁষে সাপের মতো পেঁচিয়ে চলে গেছে নদী। মানুষজনও সহজ-সরল।

আসার পর বৃষ্টি দেখলাম। আকাশের কোনো এক অচেনা ঘুলঘুলি দিয়ে ঝরতে থাকে জল। পথজুড়ে প্যাচপ্যাচে কাঁদা। সবই ঠিক শুধু রংধনুর দেখা নাই।

তমালের মন খারাপ। তেমন একটা কথা বলে না আমার সাথে। বেড়ানোর দিনও ফুরিয়ে আসছে।

একদিন দুপুরে চায়ের দোকানে বসে আছি। চায়ে ডোবানোর পর বিস্কুটের একটা অংশ ভেঙে পড়েছে কাপে। তমাল আঙুল দিয়ে সেটা ওঠানোর চেষ্টা করছে। আমি ওকে বললাম, 'আর এখানে থাকার মানে হয় না। কালই চলে যাব। এবারও দর্শন পেলি না তুই রংধনুটার।' কথা শুনে কিছু বলল না ও।

আকাশে জট পাকিয়ে আছে মেঘ। হুট করেই ঝুমঝুমিয়ে নামল বৃষ্টি। তমাল নাক উঁচু করে ঘ্রাণ নেয়। আমি পাশে দাঁড়িয়ে। একটা একটা করে বৃষ্টির ফোঁটা আছড়ে পড়ে আমাদের ওপর। বৃষ্টির ফোঁটা গোনার চেষ্টা করি। চোখ বুজে ভিজতে থাকি।

হঠাৎ তমালের চিৎকার, ধানখেতের আল ধরে ছুটতে থাকে। তাকিয়ে দেখি, আকাশের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত আস্ত একটা রংধনু। রঙের হাওয়াই সেতু। দৌড়ে গিয়ে ওটাই যেন ছুঁয়ে দিতে চায় তমাল। একটা সময় থেমে গিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে, 'দেখ, বৃষ্টির কতটা আপন এ রংধনু। বাইশটি বছর অবশেষে সার্থক আমার। এক জীবনে কটা রংধনুই বা দেখা যায়, বল?

দেশলাই-জীবন

এখন জোয়ার।

খাল জোয়ারের পানিতে টইটম্বুর। মাত্র অলকা নদী থেকে খালে এসে পড়ল নৌকাটা। এখানে পানির রং ঘোলাটে। মরা পাতা, কলাগাছ ভেসে যাচ্ছে নৌকার পাশ দিয়ে একটু পরপর। শাফকাতের ঘুম পাচ্ছে। নৌকার ছইয়ের ভেতর পাতা মাদুরে সে শুয়ে আছে। রাজ্যির ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে তার। মনে হচ্ছে মাথাটা যেন চল্লিশ কেজি ওজনের বাটখারা। শাফকাত ঘুমাতে চায়, কিন্তু এখন ঘুমানোর উপায় নেই। অনেক কাজ। অনেক কাজ নিয়ে এসেছে সে দেশে। হাতে সময় খুব কম। সবকিছু গুছিয়ে আবার ফিরে যেতে হবে। শীঘ্রই।

ভরদুপুরেও রোদের তেজ নেই একদম। কেমন ছায়া-শীতল চারপাশটা। খালে ধর্ম জাল বিছানো। মাছ ধরা হচ্ছে। ছোট ছোট বাচ্চাদের হাতে খেচইন জাল। তারা ছোট পুঁটি কিংবা চিংড়ি মাছ ধরবার চেষ্টা করছে। পাড়ের দুধারে মানুষজন কম নেই। কেউ কেউ এই ঘোলাটে পানিতেই শরীর ভেজাচ্ছে। সাঁতার কাটছে। শাফকাতের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। গ্রাম নিয়ে টুকরো টুকরো কিছু স্মৃতি। পুরোদস্তুর একটা শহুরে মানুষ এখন সে। তবু গ্রামের কথা ভোলা যাচ্ছে না। ভোলা যায় না।

এই এমন সময়ে বন্ধুদের সাথে মিলে খালের পানিতে দাপাদাপি করত শাফকাত। ন্যাংটো হয়ে। ছি ছি। ঘণ্টা খানেক পানিতে থাকবার পর ক্লান্ত হয়ে ফেরা হতো বাড়ি। বুড়ো দাদু মুড়ি ভাজত বাড়ির রান্নাঘরে বসে। গরম গরম মুড়ি। গুড় দিয়ে খেলে কী যে স্বাদ!

মাটিতে মাদুর পেতে দিত মা। পিতলের প্লেট নামানো হতো। দুপুরে গরম গরম ঝাল ডিম ভুনা, টমেটো দিয়ে প্লেন ডাল আর ভাত। কখনো টাকি মাছের ভর্তা আর আলু দিয়ে রান্না করা পুকুর থেকে ধরা মাগুর মাছ। খাবার জন্য তর সইত না। খেতে গেলেই মা ধমকাত। বলত, 'আগে মাথায় তেল দিবি। চুল আঁচড়াবি, তারপর খাওয়াদাওয়া। মাথায় তেল না দিয়া খাওয়া ভালো না, বাপ।'

কোনো রকমে মাথায় তেল ঢেলে হাত দিয়েই এলোমেলো চুল ঠিক করে খেতে বসা হতো। খাওয়া হতো ভরপেট। তারপর পাটি নিয়ে চলে

যাওয়া হতো মাঠে। ওম ওম রোদে শুয়ে পড়া হতো ঘুমের জন্য। ভাত ঘুম। উপুড় হয়ে আকাশ নেমে আসত মুখের ওপর। ঘুম আর হতো না। এই এটা-ওটা দুষ্টুমি করেই কেটে যেত আর সব ছেলেমেয়ের সাথে। বউচি, ফুল টোক্কাটুকি, গোল্লাছুট, আবার কখনো জাম্বুরা দিয়ে ফুটবল খেলা। ল্যাং মারতে গিয়ে পায়ে ব্যথা পাওয়া আর সবশেষে আবার সন্ধে হবার আগে আগে পুকুরে নেমে ঝুম গোসল। চোখ লাল হয়ে যেত। একটু যেন শীত শীতও ভাব লেপটে থাকত গায়ে।

বাড়িতে গিয়েই দেখা যেত হ্যাজাক লাইট জ্বালানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে। তখনো আঁধার নামেনি ঠিক মতো। নামবে এমন প্রস্তুতি নিচ্ছে শুধু। বাড়িতে ঢুকলেই মা বড়া পিঠা দুটো তুলে দিত হাতে। আগুন-গরম বড়া পিঠে মুখে দিয়ে প্রায়ই জিহ্বা পোড়ানো হতো। খেতে খেতেই শাফকাত টের পেত ধূপের গন্ধ। এই দারুণ গন্ধে নাকি মশা পালায়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মা ধূপের ধোঁয়ায় ঘর ভাসাত।

মায়ের বিশ্রাম নেই। বাবা আসতেন হাট থেকে। কাচকলা, পেঁপে, লাউ, মুরগি, মাছ আরও সব বাজার সদাই নিয়ে। মা লেগে যেত মাছ কাটায় আর বাবা বৈঠকখানায় বসে আরাম করে বিড়ি ধরাতেন। সাথে অনেকখানি জর্দা আর চুন মেশানো পান।

আকাশ ভর্তি করে তারা উঠত। চুলায় ভাত বসানো। মা গান ধরতেন, 'সওদাগরের নাও গো আসল সোনার ঘাটে,/ বংশী বাজে, কন্যা কাঁদে, সময় ক্যামনে কাটে?/ নাকের নোলক, রঙিন কাপড় ধুলায় হলো মাটি,/ প্রেম হইল, পুড়ল শরীর, ঘরে একলা শীতলপাটি...।

শাফকাতকে পড়তে বসতে হতো সন্ধের পর। রম্বস, ছাত্রজীবন রচনা, জুট প্যারাগ্রাফ–কোনো কিছুতেই মন বসত না ঠিক মতো। ঘণ্টা খানেক পাড় করেই খেতে বসা। একটু তাড়াতাড়ি করেই রাতের খাবার খেয়ে নেওয়া। পেঁপেভর্তা, গরুর মাংস কিংবা কোনো একটা মাছের তরকারি দিয়ে রাতের খাবার খেয়েই যাওয়া হতো উঠোনে। লোকজন সব বাড়ির বাইরে নেমে আসত এ সময়। উঠোনের মাঝে খড় জড়ো করে আগুন জ্বালানো হতো। মেয়ে-মহিলারা গল্প করত সব। বুড়োরা রাজনীতি-ফাজনীতি নিয়ে কথার তুবড়ি ছোটাত। আর শাফকাত ছোটদের সাথে মিলে খেলত গোল্লাছুট কিংবা বরফ-পানি, ছোঁয়াছুঁয়ি। এরপর ঘুম। রঙিন সব স্বপ্ন দেখবার প্রস্তুতি নিয়ে ঘুম। এভাবেই কেটে যেত দিন। এভাবেই কেটে যেত

রাত। আমরা বড় হতাম। নিজের অজান্তে বড় হয়ে যেতাম। বাবার চুল সাদা হতো। মায়ের চেহারায় ক্লান্তির ছাপ পড়ত।

গতানুগতিক, ছাপোষা জীবনে মাঝে মাঝে এলোমেলো সব ঘটনা ঘটে। একদিন বাড়ি ফিরে শোনা বাবা মস্ত এক বিষধর সাপ মেরেছে। পাকঘরের (রান্নাঘর) পাশে ঘাপটি মেরে ছিল। বাবার হাতে ছিল ছাতা। ছাতার বাঁট দিয়ে মারা হয়েছে সাপটা। সাপের সঙ্গীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। ভয়ে ভয়ে ছিল সবাই। ওঝা এসে অন্য সাপটা ধরেছে। দারুণ ভয়ে কাটানো কয়েকটা দিন।

নৌকা এসে ঘাটে ভেড়ে। বাড়ি পেছনে পুল। পুলের সাথে লাগোয়া ঘাট। শাফকাত নামে নৌকা থেকে। মাঝিকে বখশিশ দেয়। বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতেই দৌড়ে আসে পাশের বাড়িগুলোর ছেলেমেয়েরা। শাফকাতকে ঘিরে ধরে। ভিড় জমায়। নতুন অতিথি দেখে কানাঘুষা করে। হাতে থাকা মিষ্টি টোস্ট আর নোনতা বিস্কুটের প্যাকেট তাদের দেয় শাফকাত। বিস্কুট নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কয়েক বাড়ির মুরব্বিরা আসে। শাফকাততে চিনতে পারে। চেহারা, পোশাক দেখেই ধরে নেয় শাফকাতের অনেক টাকা। কার বাড়িতে শাফকাত দুপুরে খাবে তাই কথা-কাটাকাটি হয়। তারা ভাবে, শাফকাততে খুশি করতে পারলে লাভবান হবে তারা। জানে শাফকাত বিদেশে থাকে। ভাবে, এই সুযোগে হয়তো নিজের বেকার ছেলেটাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। হিল্লে হবে তবে একটা। গ্রামের মানুষদের চোখে লোভ দেখে অবাক হয় শাফকাত। বদলে গেছে সবকিছু। বদলেছে সবকিছু। বদলে গেছে সে নিজেও।

কারো কথা না শুনে নিজের ঘরে তালা খুলে ভেতরে ঢোকে শাফকাত। কেমন একটা গুমোট, দমবন্ধ হাওয়া ঘরের ভেতর। শেওলা জমেছে চারপাশে। ন্যাড়া কামরাঙার গাছটা বাড়ির জানালা ভেঙে অযথাই ঢোকার চেষ্টা করছে। সদর দরজার কাছে একটা ন্যাতানো কাগুজে ফুলের গাছ। কাছে থাকা একটা ছেলের হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে শাফকাত অল্প চাল আর দুটো আলু আনিয়ে নেয়। সাথে দেশলাই। শুকনো পাতা, ভাঙা ডাল জোগাড় করে উনুনে আগুন দিয়ে চাল বসানো হয়। মিটসেফ থেকে বের করা হয় বহুদিনের পুরনো হাঁড়ি-পাতিল, বাটি। আলুভর্তা আর ভাত হবে। গরম গরম ভাতের সাথে আলুর ভর্তার তুলনা হয় না।

খেয়ে নেয় শাফকাত। তারপর হাঁটে। হেঁটে হেঁটে যায় পারিবারিক কবরস্থানে। মা-বাবার কবর জিয়ারত করে। চোখ ভিজে আসে। বাবা-মার

শেষ দিনগুলোতে পাশে থাকবার সুযোগ পায়নি সে। বাবা যেদিন মারা যায়, সেদিন সে ফ্লোরিডায়। পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। জীবনসংগ্রামে টিকে থাকাই তখন কষ্টের। বাবা অনেকটা তার ওপর অভিমান করেই এ পৃথিবী ছেড়েছেন। ছেলে বিদেশে যাক এটা তিনি চাননি।

ইচ্ছে শাফকাতেরও ছিল না। হুট করে হয়ে যায়। ছেলেকে আটকানোর জন্য সব চেষ্টা করেছেন বাবা। বিয়ে দিয়েছিলেন তড়িঘড়ি করে। টেকেনি। টেকার কথাও না। একরকম পালিয়ে বিদেশ চলে যায় শাফকাত। দেশ ভালো লাগছিল না। সবকিছুতে হতাশা। একটা স্বাভাবিক ছেলে, সে কবি হতে চাইল। শিল্পী হতে চাইল। তার পরিবার থেকে এসব করেনি কেউ আগে। অল্প বয়স বলে বিগড়ে গিয়েছিল মাথা।

শিল্পী, কবি কোনো কিছুই আর হওয়া হয়নি। শাফকাত কাজ করেছে। কাজ করে গাড়ি-বাড়ি হয়েছে। তারপর ক্লান্ত হয়েছে। বাবার রাগ ছিল প্রবল। শাফকাতকে ক্ষমা করেননি। মা কাঁদত খুব। ভাইয়ের কাছ থেকে শুনত। একমাত্র যোগাযোগ ছিল ভাইটার সাথেই। তার ভাই। প্রাণের ভাই। মা-বাবা মারা যাবার পরও আসার সাহস হয়নি। ভয় পেয়েছিল। বাবার মেয়ে নেই। কিন্তু যে মেয়েটাকে জোর করে এনে বিয়ে দিয়েছিলেন শাফকাতের সাথে, তাকে ছেড়ে দেবার পর মেয়েটা যখন বিষ খায়, তখন মেয়েটার কষ্টটা বুঝেছিলেন শাফকাতের বাবা। নিজের ছেলে এমন কাজ করতে পারে, এমনটা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি তিনি। এমন সব ভুল-বোঝাবুঝি, রাগ-অভিমানে কেউ কাউকে কাছে পায়নি, কাছে আসার সুযোগ পায়নি। বাবা আর ছেলে কেউই না। স্মৃতি মলিন হয়। বাবা-মার কথা ভেবে রুটিন মেনে মন খারাপ করা বন্ধ করে দিয়েছিল শাফকাত।

শাফকাতের ভাই কিছু করতে পারেনি জীবনে। টাকার অভাব ছিল। বাবা-মা মারা যাবার পর গ্রামের বাড়িতেই থাকত বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে। একসময় টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয় শাফকাত। ব্যস্ততার ভিড়ে ভুলে যায় ভাইকে। পাঁচ বছর, দশ বছর পার হয়। একদিন বড় ভাইয়ের ছেলেটা যোগাযোগ করে। জানায়, তার বাবা মারা গেছে। মাকে নিয়ে সে আলাদা থাকবে। বাড়িটা বিক্রি করতে চায়। শাফকাতের অনুমতি দরকার।

বড় ভাইয়ের ছেলে সেয়ানা হয়েছে। অল্প বয়সে প্রেম করে বিয়ে করেছে। জমিজমা যা ছিল, বিক্রি করেছে সব। নেশার বদ অভ্যাস আছে। পড়াশোনাও হয়নি। সবশেষে বিক্রির জন্য বাড়িটাই আছে শুধু। শাফকাত

এত দিন পর ফিরেছে। এই বাড়িটার ব্যাপারে সুরাহা করবার জন্য। কাছের বলতে কেউ নেই আর। তবু একটা শেকড় থাকতে হয়। মন পোড়ে। অস্তিত্বের জানান দেবার জন্য, টিকিয়ে রাখবার জন্যই অর্থহীন জীবনটাকে ছুটিয়ে নেওয়া।

শাফকাত বিদেশে থাকতেই টাকা পাঠিয়ে দেয় ভাইয়ের ছেলেকে। কাগজপত্রগুলো দেখে নেবার জন্য দেশের এক বন্ধুর কাছ থেকে সাহায্য নেয়। তারপর একটা ইচ্ছে পূরণের জন্য দেশে আসে। বাবা-মা আর নিজের শান্তির জন্য আসে।

শাফকাত বাড়ির সামনে একটা টুলের ওপর বসে। বুড়ো-বুড়িরা তাকে ঘিরে ধরে। এটা-ওটা জিজ্ঞেস করে। কত গপসপ। শাফকাত বিয়ে করে থিতু হয়েছে কি না, কেমন আছে, আয় কেমন, কী করে সময় কাটে–এই সব। শাফকাত সব শোনে। সবার কথার উত্তর দেয়। পরিচিত সহজ-সরল মানুষগুলোকে দেখে মনে শান্তি আসে। বিদেশের কঠিন জীবনটায় শুধুই ক্লান্তি।

কথা বলতে বলতে শাফকাত আকাশের দিকে তাকায়। সন্ধে হয়ে আসছে। নৌকা আসতে বলা হয়েছে। ঠিক সন্ধের সময়।

শাফকাত সবাইকে বসিয়ে রেখে একটু বাসার ভেতর যায়। আসবাবপত্র, আরও টুকিটাকি যা সব দিয়ে দেয় প্রতিবেশীদের। কাড়াকাড়ি পড়ে। হুড়োহুড়ি হয়। দেশলাই বাক্সের মতো বাড়িটা এখন খালি। দরজা, জানালা, দেয়াল ছাড়া আর কিছুই নেই।

তার বাবা এটা খুব পছন্দ করত। ছোটবেলায় বলত, 'বাড়িঘর থাকবে খোলামেলা। আলো আসবে, রোদ আসবে, বাতাস আসবে। আমি থাকি বা না থাকি, আমার ঘরটা যেন খোলামেলা থাকে। এইটুকুন মাথায় রাইখো।' এমনি এমনি বলা কথা হয়তো। বলার জন্য বলা।

তাতে কি। মাথায় থেকে গিয়েছে কথাটা শাফকাতের।

সন্ধে হলে বাড়ির বাইরে বের হয় শাফকাত। দরজায় তালা লাগানো হয় না। থাক। নেবার নেই তো কিছু। আর গ্রামের মানুষগুলো বড় অপরাধ করবার সাহস পায় না। নিলে ছোটখাটো কিছুই নেবে। থাকুক এমনই। আবার হয়তো এক-দু বছর পর ফিরবে শাফকাত। তখন এমনই থাকুক বাড়িটা। এভাবেই দেখতে চায় সে। একটু না হয় ময়লা থাকবে, আগাছা-

শেওলা জমবে। ও পরিষ্কার হবে। নিজেই করবে। এক-দুদিনের জন্য এসে মেরামত করবে সবকিছু।

নৌকাটা চলে আসে। খালপাড়ে। লোকজন ভিড় করে। হাসিমুখে বিদায় জানায় সবাইকে। তারপর নৌকা চলতে থাকে। শাফকাত ছইয়ের ভেতর ঢোকে। অন্ধকারে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। এইতো জীবন। স্মৃতির কাছে পরাজিত মানুষের জীবন। কান্না আর কষ্ট। কষ্ট আর কান্না...।

শিরোনাম ডায়েরি

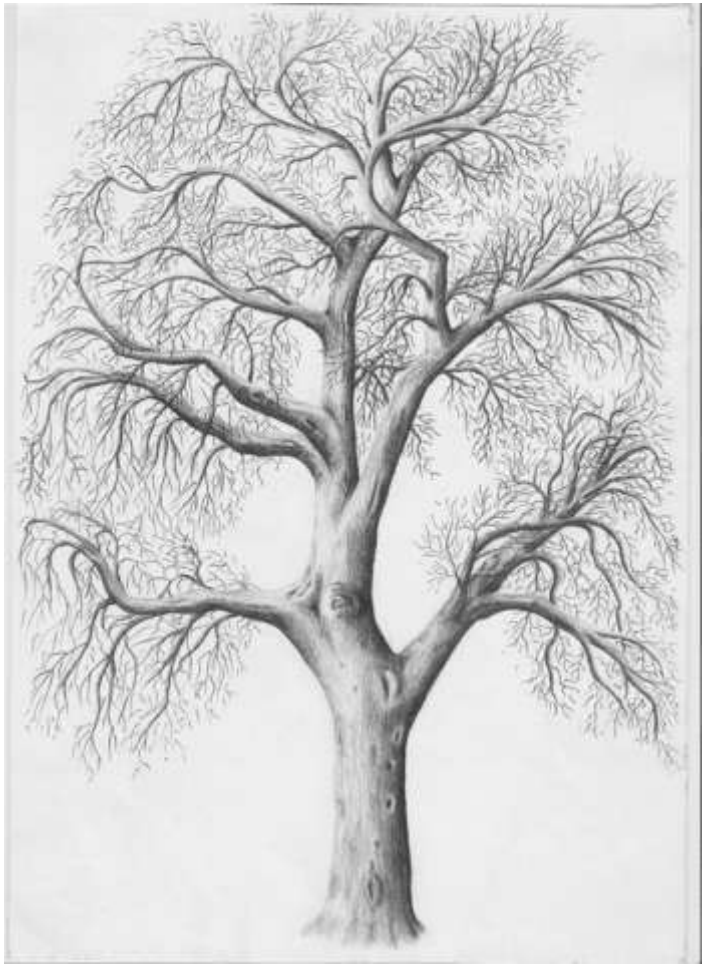

জুলাই ২

এখনো উইন্ডোজ এক্সপি নিয়ে পড়ে আছি।

স্কাইপেতে কথা বলিনি কারো সাথে কখনো, কফি ছেড়ে চা'তেই খুঁজে নিয়েছি দুঃখ তাড়ানো স্বাদ।

তিরতির করে কাঁপা পুকুরের জলে সাঁতার কাটা হাঁসের ছানার শরীর দেখে মুগ্ধ হই, গোঁফ-দাড়িতে ডাবের নরম লেওয়া লেগে থাকে, এখানে ওখানে ঢুঁ মেরে চেক-ইন বন্যায় ভাসানো হয় না জীবন।

এখনো শুনি শ্যামলের গান, মৌসুমী আর শ্রীকান্তের 'আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা', হাতে থাকে বিভূতির গল্পসমগ্র। জানালা লাগোয়া নিমগাছ হতে হাওয়া এসে ঘুমপাড়ানি গান গায়, ফিরনি, সেমাই, রসমালাই কাপকেকের চেয়ে ঢের ভালো মনে হয়। বাংলা কথার মাঝখানে আবোলতাবোল ইংরেজি শব্দের আনাগোনা নেই, মাথার দুপাশে আর সব স্মার্ট মানুষদের মতো চুল না থাকার কথা থাকলেও আমার এসব-সেসব হেয়ার কাটে আগ্রহ জন্মায়নি কখনো।

পাঞ্জাবি ভালো লাগে খুব, ফিঙে পাখির বুকের ভেতর দিয়ে ডুব এখনো জমাই ডাকটিকিট আর কয়েন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে লেবুর শরবত, চিপস বলতে পটেটো ক্র্যাকার্স আর ভালো খাবার শওকতের তেহারিই বুঝি। সকাল ভালো লাগে, ভালো লাগে দুপুর, শেষ বিকেল আর আস্ত মন আকুলি-বিকুলি করা রাত। নীলক্ষেতের পুরনো বইয়ের দোকান থেকে বই কেনা, খাবার নিয়ে মায়ের সাথে তুমুল ঝগড়া, মন খারাপ লেপে দেওয়া কবিতার শেষ দুই লাইনে বেঁচে থাকি।

এখনো ভালো লাগে পুরনো থাকতে। পুরনো এই আমি অবাক হয়ে আজকাল দেখি ভালো লাগা নেই। সবার সাথে তাল মেলাব বলে ভালো লাগাকে দূরে ঠেলে আধুনিক হয়ে যাচ্ছি। নেই আর কেউ আমার মতো। তাই কোনো একদিন, কোনো এক সময় এলোমেলো শব্দের ভিড় বাড়িয়ে অবাক হয়ে খেয়াল করি, এখন আমিও একটু একটু করে পুরনোর সঙ্গ ছেড়ে দিচ্ছি, ছেড়ে দিতে চাচ্ছি।

পুরনোই আছি এখনো। ভালো আছি। জানি না কত দিন পুরনো থাকতে পারব। ভালো থাকতে পারব। জানি না।

জুলাই ৩

সলিমুল্লাহ রোডে দারুণ শিক কাবাব পাওয়া যায়। টিকিয়া, শিক আর লুচির পর মালাই চা খেতে খেতে আড্ডা হবে। এক দুপুর, এক বিকেল, এক সন্ধে আড্ডা দিয়ে সময় পোড়াই বন্ধু চল।

ভাইয়া, টরেন্ট দিয়ে মাথা নষ্ট দুই মুভি নামালাম। নুডুলস্ আর চা খেতে খেতে চল যাই ফিল্মের ইতিহাসের গুষ্টি উদ্ধার করি। আইজেনস্টাইন থেকে হালের অনন্ত জলিল কিছুই বাদ পড়বে না শিওর বলছি।

বোন তোর মাথায় উকুন। ইশ্, কী চেহারা ডাইনির মতো। আয়, ঝগড়া করি। একটা চুলও থাকবে না। শক্তি তো দেখিস নাই।

মা, খিচুরির সাথে ডিমভাজি দিয়ো। টমেটোর সালাদে পেঁয়াজ কেন? আটটায় তুলে দিয়ো। ঘড়ির অ্যালার্মে ঘুম ভাঙে না।

বাবা, টাকা লাগবে কিছু। আজব, খরচ হলে আমি কী করব? তোমাদের আগের দিনের মতো লাইফ স্টাইল তো নাই আর। তর্ক ভালো লাগে না। গেলাম।

কাজ শেষে রাত এগারো কি বারোটায় ফিরে দেখা যায় বাড়ির মানুষগুলো ঘুমে। বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ নেই। অফিস, লেখালেখি, উড়াধুরা ইজি কাজে বিজি হয়ে বড্ড যান্ত্রিক হয়ে ওঠা দিনে দিনে। স্বপ্ন পূরণের জন্য পাগল হয়ে ওঠা মন আজকাল স্বপ্নগুলোকে ঘৃণা করে খুব। এত এত বড় হয়ে, লাখ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট করে, চার-পাঁচটা ব্যাংকের এটিএম কার্ড নিয়ে ঘুরে কোন টুউউউউটটা হবে, শুনি। অনলাইনে ফাস্ট ট্রাকের ঘড়িটা অর্ডার দেওয়া হলো না, হুট করে বন্ধুর বাড়িতে রাত কাটানো হলো না, মধুপুরে খেতে গিয়ে আনারস খাওয়া হলো না, গভীর রাতে আসা ফোনে মিষ্টি কণ্ঠের মেয়েটার কথার জবাব দেওয়া হলো না কাজের জন্য।

যে জীবন যাপন করা হয়, তা ফাঁদ বৈ কিছুই নয়। খুব কাঁদতে ইচ্ছে করে। একটা মস্ত মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে ডাক ছেড়ে চিৎকার করতে ইচ্ছে করে। শালার শহরে এক গজও খালি পাওয়া যায় না। মানুষ আর মানুষ। একা হতে দেবে না, কিন্তু একা হবার যন্ত্রণায় পোড়াবে। এ কেমন বেঁচে থাকা? পরের জনমে পাখা হোক দুটো। পাখি হব। আর ভালো লাগে না। মানুষ হওয়া, মানুষের জীবনকে অভিশাপ। স্বার্থপর তুই ফুরিয়ে যা, ফুরিয়ে যাবি।

শেইম অন য়ু মানুষ।

শেইম শেইম শেইম...।

জুলাই ৪

আমি কখনো কক্সবাজার দেখিনি।

চট্টগ্রাম অব্দি গিয়ে ফিরে এসেছি অনেকবার। সমুদ্রের গর্জন কানে আসেনি কখনো। মুঠোভর্তি ঝিনুক নিয়ে বালুর ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কবিতার জন্য আনকোরা নতুন কোনো শব্দ খোঁজার সুযোগ হয়নি। ঢেউয়ের ঝাপটায় দূরদেশ হতে ভেসে আসা কোনো ষোড়শীর নাকফুল পেয়ে এক জীবন স্বপ্ন বুনে পার করে দেবার মতো সৌভাগ্য হয়নি আমার।

বান্দরবান যাইনি কখনো।

বন্ধু, কাছের মানুষদের কাছে গল্প শুনেছি সে জায়গাটা এ পৃথিবীর নয়। সেখানে তুলোর মতো মেঘ যখন-তখন শরীর ভেজায়। জলেরও অনেক নিচের মাটি, নুড়িপাথর নাকি দেখা যায় স্পষ্ট। সেখানে গেলে ফিরতে চায় না আর কেউই। একজন বলে, 'কেই'ই বা চায় স্বর্গকে পায়ে ঠেলে কোলাহলের কারাগার এই পৃথিবীতে ফিরতে?'

যাওয়া হয়নি সিলেটে।

একসাথে অনেক জালালি কবুতরের ডানা ঝাপটানো দেখার ইচ্ছে ছিল। পাহাড়ের বুক চিরে অন্য কোনো দেশে যাবার ইচ্ছে ছিল। ইচ্ছে ছিল চা-বাগানের পাতায় পাতায় লুকোনো গল্পগুলো শোনার।

আমার কোথাও যাওয়া হয় না।

কেউ নিমন্ত্রণ করলে বলি, 'লং জার্নিতে ঝামেলা হয়। অ্যাভোমিন গিলে পাড়া বেড়ানোর ইচ্ছে একদমই নেই।' এই আমি ঘরকুনো ছেলে বড্ড ভালোই আছি। মন খারাপ হলে হাতের কাছে টেনে নেই বিভূতির 'চাঁদের পাহাড়'। কই কই যে যাই!

পাহাড়-পর্বত, জঙ্গল সব পেরিয়ে সে বড় রোমাঞ্চকর যাত্রা। যা কিছু দেখি, দেখতে চাই, চোখ বুজলেই যেন বড় স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় এ জগতে। আমার এতেই চলবে। ঝাঁ-চকচকে দিনগুলো আমি এমন করেই পার করে দিতে চাই।

দেখলেই তো সব শেষ। আর এই শেষ হওয়াতেই যত ভয়। দেখাদেখির জন্য ঢের সময় আছে। এখন না হয় নাইবা দেখলাম!

দেখার এই ভয় আচ্ছন্ন করে রাখে আমাকে। শুধু দেখতে হবে বলে প্রথম ভালো লাগা প্রিয় মানুষটিকে দেখিনি আজও।

এখনো অনেক কিছু দেখার বাকি। দেখতে হবে অনেক কিছু। এটা-ওটা-সেটা একদিন দেখব। দেখে চুষে নেব জীবনের সবটুকু স্বাদ।

একদিন দেখব। দেখতে হবে, দেখা পাব এই বোধই আমাকে বাঁচিয়ে রাখছে। আমি বেঁচে থাকছি। বেঁচে থেকে ঘরকুনো ছেলে না দেখা প্রিয় মানুষকে নিয়ে লিখছি অগোছালো লাইন–

'আমি তাকেই দেখি–
আকাশের নীল জোছনা দিয়ে মাখা,
আঁখিপল্লব তার বুনো ফুল দিয়ে ঢাকা,
তুলির আঁচড়ে ফুটে ওঠা কোনো মুখ,
নবীন শিল্পীর জল রং দিয়ে আঁকা,
আমি তাকেই দেখি–
যাকে দেখিনি কখনো।'

একদিন দেখা হয়ে যাবে ঠিক ঠিক। ঠিক ঠিক। ঠিক ঠিক...।

জুলাই ৫

এমন ঝুম বৃষ্টিতে অফিসে মন বসে না। জানালার কাচের গায়ে পাখির মতো ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আছড়ে পড়ে বৃষ্টির জল। অনেক দূর থেকে আসা একটা পুরনো দিনের গানের সুর কানে এসে লাগে। ইচ্ছে করে সব ছেড়েছুড়ে পালাই। বাড়িতে গিয়ে মুগের ডালের খিচুরি আর ইলিশ মাছ গলা অব্দি গিলে দেই ঘুম। বৃষ্টি হলেই এমন হয়। রক্তে হয়তো আছে কোনো এক নেশা। তাই এমন সব দিনে বেদনার বেনোজলে ভাসতে ভাসতে চলে যেতে ইচ্ছে করে অচিনপুর।

এইতো সামনেই বড় মাঠ ছিল। মাঠভর্তি কাশফুল। প্রায়ই অফিস থেকে বের হয়ে চলে যেতাম। কাশফুলের ভেতর লুকিয়ে আড়াল করতাম নিজেকে। এখন কাশফুল নেই। কোনো এক বিখ্যাত মানুষ আসার কারণে ছেঁটে ফেলা হয়েছে বসুন্ধরার এদিককার সব কাশফুল।

দূর থেকে এখন শুধু তাই চোখে পড়ে ন্যাড়া মাঠ। মাঠের ওপর আকাশ। সেই আকাশে কচি-বুড়ো মেঘ। একটা মেঘ ভাল্লুক হয়, একেকটা বক কিংবা প্রিয়জনের মুখ। কোনোটা পাহাড় আবার কোনোটা পেটের ভেতর পুরে নেয় আস্ত কাশবন। কাজ ভুলে বের হই বাইরে। এমন বৃষ্টিতে রিকশাই সম্বল। ন্যাড়া মাঠের পাশের রাস্তা দিয়ে যখন রিকশাটা যায়, তখন কেন জানি বেড়ে যায় বৃষ্টির বেগ। কাশফুল নেই বলে রিকশার পর্দায় আড়াল করি নিজেকে। কিন্তু সব হিসাব ওলটপালট হয়। আমার রক্তের

ভেতর নেশা, চোখের সামনে অচিনপুর। বেদনার বেনোজলে ভাসতে ভাসতে তাই সব ভুলে কবিতা আওড়াই–

'ঝুম বৃষ্টি দেখে লুকাব বলে,
নিজেকে ঢেকে নিয়েছিলাম পর্দার আড়ালে,
বুঝিনি তো এই আমি নিজেই হয়ে আছি উন্মুখ,
ভিজব আজ বৃষ্টির জলে...।'

জুলাই ৬

বাবার কথা শুনিনি তেমন কোনো দিনই।

বাতাসের খাঁচায় বন্দী ছিল জীবন। জানালার ভেতর আচমকা চলে আসত চৌকো আকাশ। হাতের আড়ালে অগ্নিপুত্র আর টিনটিন। পাখির মতো বন্য আমি নৌকার পালে রং আর তুলি দিয়ে লাল রং মাখাই। ছবিগুলো হুড়মুড়িয়ে আসে-যায় ঘুমের ভেতর, স্বপ্নে।

ছবি আঁকা শিখব শুনে বাবা বলেন, 'ভ্যানগগ একটাই। ও তুমি হতে পারবে না। জয়নুল, হাশেম খান হবার সম্ভাবনাও দেখি না। এই চ্যাপ্টার বাদ।' আমি তো ভ্যানগগ, জয়নুল বা হাশেম হব না, বাবা। ছোট করে হলেও, অধম হলেও আমি আমিই হতে চাই। অতঃপর অভিমানে ফিজিকস বইয়ের ভেতর গোপন 'কাকাবাবু সমগ্র'টা কুচি কুচি করে ছেঁড়া হয়। ঘরের দেয়ালে জেমসের পোস্টার। দিনমান বাজে, 'লেইস ফিতা...লেইস।' গিটার বাজানোর শখ। বন্ধুর গিটারের তারে আমার রক্তের নোনা স্বাদ। ওতে জং ধরে সুর হয়ে বাজে একেকটা অল্পবয়সী গান। বিটলসের এ-বি-সি-ডি, রবীন্দ্রনাথের আদর্শলিপি, কিং ক্রিমসন, দুটো লালনের গান আর নজরুলের 'উচাটন মন ঘরে রয় না..।' শুনে সময় পোড়াই।

বন্ধুর হাতে বাঁশি, মন্দিরা, মাউথ অর্গান আর আরেকজন তবলায় পাউডার লাগিয়ে বলে, 'নে কিঙ্কর, একটা গান ধর।' নাগরিক কবিয়ালদের কথা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন বাবা। বলেন, 'আমার বাসায় ওসব হিপ্পিগিরি চলবে না বলে রাখলাম। আমি সহ্য করব না। কাল থেকে এই চ্যাপ্টার বাদ।' দূর্বা ঘাসে শরীর বিছিয়ে দিয়ে ভাবি, এবার তবে ফিল্ম হোক। অই তো আইজেনস্টাইন, ডালি, ঘটক আর সত্যজিৎ। এবার

ক্যামেরা হাতে নিতেই হবে। শট ডিভিশন, ব্রেকডাউন শেষে বাবার অনুমতি নিতে যেতেই বাবার হুকুম, 'যাত্রাপালা শুরু হলো অবশেষে। এক পা-ও নড়বে না বলে রাখলাম। সঙ সেজে এসব করে বেড়ানো আমার বাড়িতে চলবে না।' প্রি-প্রোডাকশনেই স্বপ্নের কবর দেই অবশেষে। লেখালেখিই ভালো। এ নিয়েই তো আমার এত দিনের আরাধনা।

বিমল কর, কমলকুমার, সন্দীপন, শক্তিরা বলে যায়, এবার তবে কলম দিয়ে তোমার শহর শাসন করো। তত দিনে মেঘ সরে গেছে। বড় হয়েছি। বাবা নরম কণ্ঠে বলে, 'বিসিএসটা দিয়ে দাও তো। এসব করে কী হবে, বলো? আমার মতো হও। তোমার পরিবারের আর দশটা ছেলের মতো হও।' ধাক্কা খেতে খেতে, স্বপ্ন ভাঙতে ভাঙতে আমি শামুক হয়ে গেছি। খোলসের ভেতর লুকিয়ে রাখি নিজেকে। গোপন রেখে সব বাবার কথায় সায় দেই। আর মনে মনে বলি, সবাই ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হলে কি চলে, বাবা?

কেউ না কেউ তো কবি হবে। হবে গায়ক, লেখক, চলচ্চিত্র পরিচালক। তুমি আর থামাতে পারবে না আমাকে। আমি হাঁটতে শিখে গেছি। জীবনের এই চ্যাপ্টারটা কখনোই বাদ দেব না আমি। কখনো না।

I may not be RICH,
But i will be different,
I WILL BE DIFFERENT...

জুলাই ৭

হবে না আমাকে দিয়ে।

আমাকে দিয়ে হবে না।

পৃথিবী নামক গ্রহে আমি এক পরাজিত মানুষ। থেমে গেলাম। থামলাম আমি চিরতরে।

আমার জন্য কেঁদো না। কাঁদেনি। কেউ কাঁদবেও না কোনো দিন। হায়!

জমাটি দুঃখ-সুখ

গল্পের খনি

প্রমিতি আপু মারা যাবার দিন মিষ্টি বিলানো হয়েছিল।

সামনে এইচএসসি পরীক্ষা। রোদের ভেতর শরীর ডুবিয়ে হাইড্রোকার্বনের চ্যাপ্টারটা ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম। নিচতলার আন্টি এসে বলল, 'প্রমিতির ছেলে হয়েছে। মা আর ছেলে ভালো আছে দুজনেই।' কেয়ারটেকার মিজান সাদা-কালো মিষ্টি দিয়ে গেল দুই প্যাকেট। দাঁতে ব্যথা নিয়েও খেলাম সে মিষ্টি। বাড়ির গেটে দাঁড়ানো রাতভর গাঁজা টেনে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে থাকা রিকশাওয়ালা আর পথের ধুলোয় গা পেতে দেওয়া কুকুরগুলোও মিষ্টি খেল ভরপেট।

বাড়িভর্তি মানুষ। গেটের সামনে গাড়ির ভিড়। ছেলে দেখতে বাবার মতো হয়েছে, এটা বলতে বলতে আনন্দে পায়চারি করতে দেখি আপুর ননদকে। পড়াশোনা মিটসেফে তুলে রেখে আমি মানুষ দেখি। টক-ঝাল-মিষ্টি গল্পের স্বাদ নেই। কেমিস্ট্রি বইয়ের ভেতর লুকোনো 'শেষ বিকেলের মেয়ে' উপন্যাস। দারুণ প্রেমে মন আনচান করে। সময় হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোয়। দুপুর থেকে টের পাই মানুষের ছোটাছুটি। সব নীরব, তবু জঘন্য, অগোছালো শব্দ যেন আসে কই হতে!

ভিড়ের মতো একটু জায়গার এলোমেলো কথা থেকে কিছু শব্দ কুড়িয়ে নিয়ে সাজাই। বুঝি, শুনি প্রমিতি আপু মারা গেছে। কী যেন একটা ছবির সাথে পুরোপুরি মিলে যাওয়া গল্প।

আপুর বেঁচে থাকা বড় মেয়ে নবনী ছাদে বসে কাঁদে। ব্যাডমিন্টনের মৌসুমে একটা কর্ক এসে পড়ে তার পাশে। অন্য বাড়ির ছাদ থেকে সে কর্ক চেয়ে ডাকাডাকি করলেও নবনী জবাব দেয় না। সে কেঁদেই যায়। আমি হাইড্রোকার্বনকে বিদায় জানিয়ে টর্ক নিয়ে মেতে উঠি। সায়েন্সের যত্তসব হাবিজাবি জিনিস।

মা বকে। বই টেবিলে রেখে যেতে হয় প্রমিতি আপুর বাসায়। দেখি সকালে মিষ্টি দিতে আসা আন্টিটা কাঁদছে। আপুর চরম নাস্তিক বাবা কাছে

টেনে নিয়েছে কোরআন শরিফ, টেবিলে জিরোচ্ছে গরুর শুকনো, ঝুরঝুরে মাংস, পুরনো কাছাছুল আম্বিয়া আর এত সবের ভেতর আগরবাতি জ্বেলে দেয় কে যেন!

মিষ্টিগুলো চুপচাপ বিশ্রাম নেয়। তা-ও পারে না। ওদের শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটায় রাজ্যির পিঁপড়া। তারপর ক্যালেন্ডার বদলায়, বদলাই। নবনী বড় হয়। প্রমিতি আপুর বরটা বিয়ে করে, বেঁচে থাকা ছেলেটা স্কুলে যাবার মতো বড় হয়। আমি চাকরিতে-ফাকরিতে ঢুকেও জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রোদে শরীর লুকাই। জানালা লাগোয়া নিমগাছটার পাতায় দোল দেয় বেয়ারা হাওয়া। আকুলিবিকুলি সময়ে মৃত্যুভাবনা ঘিরে ধরে। মন খারাপ করতে করতে আনন্দভ্রমণে থাকা আমিটাকে মৃত্যু না যতটা অবাক করে, তার চেয়েও বেশি অবাক করে মৃত্যু আর জন্মের এমন পাশাপাশি অবস্থানে থাকাটাকে। অনেক বছর পর আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। শুধু পাত্র-পাত্রী ভিন্ন। হাতে ইলিয়াসের ছোট গল্পের সংকলন নিয়ে পাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে কান্নার ভেতরেও চোখে পড়ে বিশ্রাম নেওয়া সাদা-কালো মিষ্টিগুলো। সেই একই মিষ্টি। একই রকমভাবে ওদের শান্তি নষ্ট করছে রাজ্যির পিঁপড়া। সাদা-কালো মিষ্টিতে লাল-কালো পিঁপড়া।

আহ্! গল্পের খনি পৃথিবী সুন্দর। নির্মম সুন্দর।

বন্ধুর চিঠি

প্রিয় ব্যাকবেঞ্চারস,

আছিস ক্যামন তোরা? আমি ভালো নেই। ক্লাসে স্যার পড়ানোর সময় কানে হেডফোন গুঁজে গান শুনতে শুনতে বই পড়াটা মিস করি খুব আজকাল। অফিসে বড্ড ঝামেলা। একটুও মজা নাই। বেশি বোরিং লাগলে ওয়াশরুমে গিয়ে বসে থাকি। বসে বসে টেম্পল রান খেলি। এখানে প্রক্সি দেবার জন্য আমার আশিকের মতো বন্ধু নেই। সেই যে পরীক্ষার সময় টেবিলে প্রায় ছয়টা চ্যাপ্টার লিখে ফেলেছিলাম আমি, সেই টেবিলটা আমার চাই। আমার অফিসের টেবিল একদম ফকফকা। ইশ্, না জানি কোন জুনিয়র ভাই সেই টেবিলে বসে পরীক্ষা দিয়ে আমার গুণকীর্তন করছে এখন!

আমি আর মশা (নাম বলা যাবে না!) যে ফিন্যান্সের মেয়েটাকে একই সাথে মন দিয়েছিলাম, তাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করল আজ। আহা, অযথাই মন উচাটন হয়। বন্ধুরা, অফিসের ক্যানটিনটা ভালো। দামও কম। পুরাই শেরশাহের আমল! কিন্তু ক্লাস শেষে একটা ভেলপুরি টানাটানি করে পাঁচজন মিলে খাওয়ার যে আনন্দ, সেটা পাই না রে একদমই।

সকাল সকাল সূর্য সেন হলের বেলের শরবতের মতো লিকুইড খিচুরিও যদি কেউ খেতে দেয় এখন, তোরা পাশে থাকলে ঠিক ঠিক সেটা আমি খেয়ে ফেলব, দেখিস!

প্রেজেন্টেশনের আগের দিন রাশেদকে ফোন দেওয়াটা মিস করি খুব। 'দোস্ত, তুই'ই সব করে ফেললি ক্যান! আমাকে বলতি। সব কাজ করে দিতাম। আচ্ছা যা, নেক্সট টাইম।' গ্রুপ লিডারকে এই কথা বলার পর তার মুখটা খুব দেখতে ইচ্ছে করে রে। বাথরুমে গিয়ে অধূমপায়ী আমি তোদের সিগারেটের ধোঁয়ার স্বাদ কত দিন যে নেই না!

ও শোন, আফ** ম্যামকে স্বপ্ন দেখলাম ওই দিন। স্বপ্নে তার পারফিউমের ঘ্রাণ পেলাম। কী আশ্চর্য, সারা দিন সে ঘ্রাণ আমার মাথার ভেতর ছিল। পকেটে টাকা নাই, তাও সবাই মিলে খেতে যাবার সাহস নেই আর আগের মতো আমার। এই অফিস লাইফে আমি বড্ড ভিতু। ঝাড়িটারি খাই। মুখ বুজে সহ্য করি।

ও ভুলেই গেছি, শোন সিয়ামাত তোর ডিএসএলআরটা কই? কেউ ছবি তোলে না এখন আর। নতুন চশমার ফ্রেম নিলাম। ভাব নিয়ে যে একটা ছবি তুলব, সে সুযোগ কই? তুহিন আর ফুজায়েল অনেক দিন মালাই চা খাওয়ায় না। লম্বু জিরাফ মেহেদিও বলে না, সকাল থেকে পাঁচটা মধুবন টোস্ট ছাড়া আর কিছুই খাই নাই, দোস্ত। চল খেয়ে নেই। আলামিন, মিনহাজ, সাইফুল, রিয়াদ, রকিব, আকাশ, ইফতেখার, মনির, শাহাদাত, জন্ডিস মেহেদি তোদের মিস করছি খুব। তার চেয়েও বেশি মিস করছি তোদের নিয়ে ক্লাসে বসে আশিকের আঁকা নোংরা ছবিগুলো। ওই বিপাশা 'অষ্ট ব্যঞ্জনে' কবে যাব? খাওয়া তো পাওনা ছিল একটা। বাই দ্য ওয়ে, এখন ঘুমাব। কাল সকালে আবার ছুটতে হবে। জীবনটা

হঠাৎ করেই কঠিন হয়ে গেল। এমন তো ছিল না সবকিছু। এমন তো হবে ভাবিনি আগে। কোন ব্যাটা জানি বলেছিল, ইশকুল-কলেজের পর আর কোনো বন্ধু হয় না। যা হয় তা হলো সহপাঠী। ভুল। কঠিন ভুল। যদি না হতো, তবে তোরা কী?

শোন, আমি ভাবতাম ব্যাকবেঞ্চারের আমরা খুব খারাপ। কিন্তু আমার ভাবনা ভুল ছিল। এই যে, মানুষের ভিড়ে এসে দেখি এখন আমরাই সবচেয়ে ভালো ছেলে। এখন বুঝি ব্যাকবেঞ্চাররা, খারাপ ছাত্ররাই সত্যিকারের ভালো ছেলে। ভালো মানুষ।

আজ ক্যাম্পাসে গিয়েছিলাম। ওখানকার বাতাসে নিশ্বাস নিতে সে যে কী দারুণ লাগে! বন্ধুরা, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি আবার ছাত্র হতে চাই। আরও একশত বছর ছাত্র থাকতে চাই। ম্যানেজ কর না, পিলিজ। দোহাই লাগে। বাঁচা।

ইতি
অনুগত বন্ধু

রক্ত, কষ্ট, শোক

উঠুন, জাগুন, সেহরি খান।

মাইকিং হচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকায় তুষার। তিনটেও বাজেনি। এর মাঝেই মাইকিং শুরু হয়েছে। সেহরির জন্য মা জাগতে জাগতে আরও আধঘণ্টা। ততক্ষণ অপেক্ষা। খিদে লেগেছে খুব। মা রাতে সল্টেজ বিস্কুট আর মুড়ি দিয়ে গিয়েছিলেন। খাওয়া শেষ। খাবার খোঁজা তুষারের কাজ না। এসব তাকে মানায় না। তার কাজ পড়াশোনা করা।

বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঝিঁঝি পোকারা ডেকেই যায়। রাস্তার বাতিগুলো জ্বালানো। দু-একটা লোককে আধো আলো-অন্ধকারের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখা যায়। দোতলার জানালা দিয়ে দেখতে পায় তুষার। প্রতিদিন দেখে। তার রুটিনে কোনো হেরফের নেই। কেমন ন্যাতানো একঘেয়ে এক জীবন তার।

তুষার ক্রিকেট খেলত দারুণ। সে পড়ুয়া ছেলে। পড়াশোনায় সবার চেয়ে ভালো। মা-বাবার বাধ্য ছেলে। এসএসসিতে সবার চেয়ে ভালো রেজাল্ট। বাড়ি বাড়ি মিষ্টি বিলানো। সুন্দর সব দিন। অতিথি-আত্মীয়দের প্রশংসাবাক্য। আরো বেশি পড়াশোনায় মন দেওয়া। বাবা-মায়ের আদেশ, আদরে বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ বন্ধ। এইচএসসির রেজাল্টও যথারীতি ভালো। সব ঝামেলা শুরু হয় এসএসসির পর। কোনো ভালো জায়গাতে ভর্তি হবার সুযোগ পায় না সে। মা-বাবার আদর, খবরদারিতে একদম নার্ভাস হয়ে পড়ে সে। নতুন সব জায়গায় গিয়ে পরীক্ষা দেবার সময় ভয় বাড়তে থাকে তার। ভয়ের কারণে লিখতে পারে না। ভুলে যায় মাথার ভেতর যা আছে, তা-ও।

একের পর এক ব্যর্থতার পর তার বাবা বিরক্ত হয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ফলাফল আর আনতেই যায় না। এর মাঝেই একদিন বন্ধু মারফত খবর আসে, তুষার একটি ভালো জায়গায় চান্স পেয়েছে। কিন্তু ভর্তির সময় পার হয়ে যাবার কারণে পড়ার সুযোগ নেই আর। তুষারের ভেতরটা ভাঙতে শুরু করে এই খবরটা শোনার পর থেকেই। সে বুঝতে পারে, পৃথিবীর পরাজিত মানুষদের তালিকায় তার নাম

লেখা হতে যাচ্ছে। গুটিয়ে নেয় নিজেকে সে। একটা বাজে প্রতিষ্ঠান থেকে মাস্টার্স শেষ করে সে।

অতিথি-আত্মীয়দের প্রশংসাবাক্য নিন্দায় বদলে যায়। সবার চোখে ভালো হলেও পরাজিত মানুষের উদাহরণ হয়ে ওঠে তুষার। পড়াশোনা শেষে তারপর চাকরি খোঁজা। লিখিত পরীক্ষাগুলো উতরে যাওয়া যায়, কিন্তু ভাইভা বোর্ডে গেলেই যত ঝামেলা। নার্ভাস তুষার কিছুই বলতে পারে না। তার সব কথা আটকে যায়। চাকরি আর হয় না। বয়স পার হয়ে যায়। লবিংয়ের পর একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে কয়েক মাস চাকরি করেছিল সে। অল্প বেতন। গাজীপুরে একটা খুপরি ঘরে থেকে কাজ করতে হয়েছে তাকে। সারা রাত কাজ থাকত অফিসে। সকালে বাসায় এসে আর ঘুম হতো না তুষারের। এক মাসে ষোলো কেজি ওজন কমে গিয়েছিল তার। ছেলের এই অবস্থা দেখে বাবা এসে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল।

তার পর থেকে বাসাতেই আছে তুষার। ক্লান্ত তুষার। অনেকটাই পরাজিত তুষার। শেষবারের মতো বিসিএস পরীক্ষাটা দিচ্ছে সে। একটা ভালো চাকরির জন্য। এটাই শেষ সুযোগ। তারপর আর বয়স থাকবে না।

মাইকিং চলতেই থাকে। জানানো হয়, সেহরির শেষ সময়। তুষারদের বাড়ির দোতলার কাজ চলছে। একটা রুম ঠিকঠাক হয়েছে মাত্র। সেটাতেই এসে উঠেছে তুষার। এখানেই থাকে। পড়াশোনা করে। কেউ ঘাঁটায় না তাকে। বাবা-মাও আর আসে না এদিকে।

তুষারের মাথায় এলোমেলো চিন্তা আসে। সে রোজা নিয়ে ভাবে। শৈশবে রোজা রাখা হতো চব্বিশ ঘণ্টার। প্রথম দিন বারোটা পর্যন্ত এবং তার পরের দিন আবার বারোটা, এভাবে পাক্কা চব্বিশ ঘণ্টা। চব্বিশ ঘণ্টায় এক দিন, ছোট্ট মানুষের মাথায় হিসাবটা বরাবর এমনই ছিল। রোজা শেষে ঠিকঠিক বারোটায় একটা কলা কিংবা দুটো মিষ্টি টোস্ট দিয়ে তুষারের করা হতো ইফতার। ছোট্ট মানুষের রোজা রাখতে কষ্ট, পারবে না, এমনটাই ধারণা ছিল বাবার। তাই এমন বোকা বোকা নিয়ম ঢুকিয়ে দিয়েছিল মাথায়। তখন সব বিশ্বাস করা হতো। বাবার কথাও বিশ্বাস করেছিল তাই। এরপর তারপর কয়েক পা হেঁটে আরেকটু বড় হওয়া। জীবন মানেই আনন্দ, এলোমেলোমি খেলাধুলা। ঈদ করা হবে নানুবাড়ি। চাঁদ উঠেছে, চাঁদ উঠেছে বলে ছেলেপুলে চিৎকার করে ভড়কে দেব সন্ধেরাতের মাঝখানটা। নানু তুষারকে ফাঁকি দেওয়া শিখিয়েছিল। রোজা রাখবই, এই

জেদের কাছে হার মেনে অবশেষে বলেছিল, 'নানুমণি, পুকুরে একসাথে নাইতে নামার সময় ডুব দিয়ে কিছুটা পানি খেয়ে নিয়ো তবে। ওতে ক্ষতি নেই।' কী সরল কথা। আর তুষারই না কত বড় বোকার হদ্দ! এই সব আজগুবি কথা মেনে নিয়েছিল। করুণাময়কে কি ফাঁকি দেওয়া যায়?

পারত না। খিদে সহ্য করা কঠিন। তুষারকে দিয়ে একদমই হয় না। মনে পড়ে অনেক চেষ্টা করে একদিন দুপুর তিনটে পর্যন্ত না খেয়ে থাকার কষ্টটা। বাধ্য হয়ে বন্ধু মিথুনের সাথে মিলে খেয়েছিল বড়ই। তারপর একদিন হুট করে বড় হয়ে যাওয়া। গুনে গুনে রোজার সংখ্যা বাড়ায় তুষার। 'বন্ধু, তুই বারোটা রেখেছিস, আমি এবার তবে রাখলাম পনেরোটা। ঠিক আছে?' এভাবেই বলত তুষার। জেদ ছিল বৈকি। গর্বের ছিল।

আজকাল রোজা জানি কেমন! লোক দেখানো ব্যাপার। সংযমের কিছু নেই। অগোছালো ভাবনা ভাবতে ভাবতে নিচে যায় তুষার। শরীর ভালো না তার। ঘরে আলো দেখতে পায়। তার মানে মা উঠেছে ঘুম থেকে। খাবার দেওয়া হবে টেবিলে। মায়ের এমনিতেই ঘুম হয় না। সারা রাত জেগে থাকে। সেহরির পর সে নামাজ পড়বে। তারপর কোরআন তিলাওয়াত। ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত তার কোরআন তিলাওয়াত চলবে।

তুষারের বোন রিতা টেবিলে খাবার দেয়। মেয়েটার চোখ ফুলে লাল। আজও কেঁদেছে হয়তো। সংসারটা ভেঙে যাবার পর থেকে তার কান্না থামছে না। স্বামী তাড়িয়ে দিয়েছে মাস খানেক হলো। প্রতিদিনই নিয়ম করে কাঁদে মেয়েটা।

এসব মনে করতে চায় না তুষার। সে সুন্দর কিছু ভাবার চেষ্টা করে। সুন্দর করে থাকতে চায়। শৈশবের রমজানের কথা মনে পড়ে। শৈশবে রোজা রাখা হতো চব্বিশ ঘণ্টার। প্রথম দিন বারোটা পর্যন্ত এবং তার পরের দিন আবার বারোটা, এভাবে পাক্কা চব্বিশ ঘণ্টা। চব্বিশ ঘণ্টায় এক দিন, ছোট্ট মানুষের মাথায় হিসাবটা বরাবর এমনই ছিল। রোজা শেষে ঠিকঠিক বারোটায় একটা কলা কিংবা দুটো মিষ্টি টোস্ট দিয়ে করা হত ইফতার। ছোট্ট মানুষের রোজা রাখতে কষ্ট, পারবে না এমনটাই ধারণা ছিল বাবার। তাই এমন বোকা বোকা নিয়ম ঢুকিয়ে দিয়েছিল মাথায়। তখন সব বিশ্বেস হতো। ছোট তো তাই।

এরপর তারপর কয়েক পা হেঁটে আরেকটু বড় হওয়া। জীবন মানেই আনন্দ, এলোমেলোমি খেলাধুলা। ঈদ করা হবে নানুবাড়ি। চাঁদ উঠেছে, চাঁদ উঠেছে বলে ছেলেপুলে চিৎকার করে ভড়কে দেবে সন্ধেরাতের

মাঝখানটা। নানু ফাঁকি দেওয়া শিখিয়েছিল। রোজা রাখা হবেই এ জেদের কাছে হার মেনে অবশেষে বলেছিল, 'নানুমণি, পুকুরে একসাথে নাইতে নামার সময় ডুব দিয়ে কিছুটা পানি খেয়ে নিয়ো তবে। ওতে ক্ষতি নেই।' কী সরল কথা। আর তুষারও না কত বড় বোকার হদ্দ! এই সব আজগুবি কথা মেনে নিয়েছিল। করুণাময়কে কি ফাঁকি দেওয়া যায়?

পারত না। খিদে সহ্য করা কঠিন। তুষারের মনে পড়ে অনেক চেষ্টা করে একদিন দুপুর তিনটে পর্যন্ত না খেয়ে থাকার কষ্টটা। বাধ্য হয়ে বন্ধু মিথুনের সাথে মিলে খাওয়া হয়েছিল বড়ই। রোজার পরই ঈদ। চ্যানেল একটাই তখন। বিটিভি শুধু। 'চাঁদ উঠছে, চাঁদ উঠছে' বলে রাস্তায় ছুটতে ছুটতে, বাড়ির পাশ কাটাতে গিয়ে কানে আসত 'রমজানের ওই রোজার শেষে এল খুশির ঈদ...।'

মোটা-বেঢপ টিভি থেকে ভেসে আসত গানগুলো। তারপর ঈদের আগের রাতটায় ঘুম নেই চোখে। জামাকাপড় যা কেনা হয়েছে, লুকিয়ে রাখা হয়েছে সব। ঈদের দিন দেখানো হবে বন্ধুদের প্রথমবারের মতো। ঈদের দিন সবচেয়ে কষ্ট ছিল ঘুম থেকে ওঠা। তুষারের বাবা খুব সকালে উঠতেন। টিউবওয়েলের পানি দিয়ে গোসল, তারপর পাঞ্জাবি পরে আতর লাগানো হতো। এটাই নিয়ম। রাতে ঘুম না হওয়ায় চোখে ঘুম লেগে থাকত। বাবার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে গোরস্থান রোডের মসজিদে যেত তুষার। জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ। সবচেয়ে আনন্দের ছিল কোলাকুলির অংশটা। পরিচিত-অপরিচিত সবার সাথে এটা হতো। নামাজ শেষেই বাসার দিকে দৌড়। রুহ আফজার শরবত ছাড়া ঈদের সকালটার কথা ভাবাই যায় না। সেমাই কিংবা ফিরনি আর ঝাল কিছু বলতে গরুর মাংসের সাথে লুচি। অমৃত যেন।

পটকা পাওয়া যেত। সারা দিন অই পটকা ফাটিয়েই কেটে যেত। দুপুরে কোনো এক বন্ধুর বাসায় খেয়ে নিত তুষার। সালামি নেওয়া হতো জোর করেই। দুই টাকা, পাঁচ টাকার কড়কড়ে নতুন নোট। তারপর ঝুপ করে সন্ধে নামত। সবার মন খারাপ। মনে হতো, ঈদটা মনে হয় চলেই গেল। ইশ্, ঈদটা এক দিনের কেন হয়? রাতের বেলা বিটিভিতে ঈদের নাটক আর ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান। এক দিনে ঈদ শেষ হতেই দেওয়া হতো না। টানা তিন দিন চলবে আনন্দ। পড়াশোনা বন্ধ। এইতো ঈদ। ভালোবাসার, ভালো লাগার ঈদ।

তুষারের এসব আনন্দের কথা ভেবেও কষ্ট হয়। জীবনের সব আনন্দ ফুরিয়ে গেল এটা ভাবতেই হতাশা এসে ঘিরে ধরে। কেমন একটা ধার করা জীবন যেন তার। কোনো মৌলিক কিছু নেই। রোমাঞ্চকর কিছু নেই। জন্ম থেকেই পরাজিত এক।

সকাল হয়। তুষার প্রস্তুতি নেয়। পরিবারের সবার দিকে তাকায় একবার। সবাই সম্মতি দেয়। সম্মতি দেওয়াই স্বাভাবিক। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মা ভালো নেই। একাই পরিবারটা টেনেছে অনেক দিন। একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকের বেতন খুব বেশি না। স্বামী উড়নচণ্ডী। একের পর এক ব্যবসায় লস। জমি বন্ধক। ঝগড়া। ছেলে বেকার। মেয়ের বিয়েবিচ্ছেদ আর মানুষের নানান কথা। তিনি আর পারছেন না। ক্লান্ত। সবুরে মেওয়া ফলে, এ কথা তার বেলায় সত্যি নয়। তিনি সবুর করতে করতে বুড়ো হয়ে গিয়েছেন, তবু বিধাতা তার দিকে তাকায়নি। তুষারের বোনটা অনেক আগেই মরতে চেয়েছিল। প্রেম করেছিল কলেজে। ছেলে তাকে ছেড়ে অন্য মেয়ের কাছে চলে যায়। তুষারের বোনের কপালটা ভালো না। গাঁটছড়া বাঁধতে পারল না কারো সাথে। না স্বামী, না প্রেমিক। প্রথমবার স্যাভলন খেয়েছিল। মরেনি। শেষ রাতে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছিল হাসপাতালে। মেয়েটার বাঁচার ইচ্ছে তখন থেকেই নাই হয়ে গিয়েছে।

বাবা এখন চুপচাপ। ক্লান্তি কিংবা শান্তি, কোনো কিছু নিয়েই আর ভাবনা নেই তার। তিনি যেতে চান। তুষারের ওপর অনেক দায়িত্ব আজ। নিজেকে এই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কেউ মনে হচ্ছে।

বাড়ির পাশেই রেললাইন। সেই প্রতিদিন শোনা কু ঝিক ঝিক ঝিক...।

রোজা রাখা হবে। আজই শেষ দিন। চাঁদ উঠলেই ঈদ। কী আনন্দ! ঘরে ঘরে সবাই মেতে উঠবে আনন্দে। শুধু তুষারদের ঘর থাকবে শূন্য। তুষারের মা চায় না কেউ তাদের কথা মনে করে কষ্ট পাক। ঈদের আনন্দে তাদের নিয়ে কারো শোকটুকুন কেটে যাক।

একসাথে শেষ হয়ে যাবে একটি পরিবার। পরাজিত পরিবার। সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে এই জীবন নিয়ে। মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে।

শেষ দরকার। দরকার পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার। মানুষের ঠাট্টা, ব্যঙ্গ সব শেষ হবে এবার।

আজ রাত থেকে কোনো কিছু পাওয়ার ঝামেলা নেই, হারানোর কষ্ট নেই।

তুষার নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। ভাবে, মরার জন্য এ কী অদ্ভুত সময় বেছে নিল! ঈদটা কাটিয়ে গেলে মন্দ হতো না!

সময় বয়ে যায়। সন্ধে হলে ট্রেন আসবে, আসে। আওয়াজ শোনা যায়।

তুষারের কেন জানি একটু বাঁচতে ইচ্ছে করে। এই পৃথিবীকে সে নিজের আপন নিবাস করতে চেয়েছিল। অনেক স্বপ্ন ছিল, শখ ছিল। কিছুই হলো না। না হলে খুব কি সমস্যা? এক জীবনে সবকিছু কি হতে হয়? হয়। নিজের জন্য প্রয়োজন না হলেও সমাজের জন্য প্রয়োজন। সমাজ চায়। বাধ্য করে। না পারলে তিরস্কার।

তিরস্কার সহ্য হলো না তুষারদের পরিবারের। রেললাইনের মাঝে দাঁড়িয়ে যায় তাই।

ট্রেন যায়। কু ঝিক ঝিক ঝিক।

চারটা লাশ পড়ে থাকে রেললাইনের ওপর। ঠিক তখনই চাঁদ ওঠে।

ছোট বাচ্চারা দৌড়ায় আর আনন্দে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'চান উঠছে। চান উঠছে।'

কী আনন্দ!

এ আনন্দে মুছে যায় রক্ত, কষ্ট, শোক, পরাজয়ের যন্ত্রণা, তুষার, তুষারের পরিবার...। মুছে যায়।

ত্রিচারিণী

নিজেকে ভালোবেসেছ?

ল্যাম্পপোস্টের নিচে কোনো এক রাত্তিরে ল্যাপটপ, কাগজ, কলম, ক্যালকুলেটর নিয়ে বসে যাওয়া, হিসাব নিতে নিতে জমে যাওয়া কাজগুলো নিয়ে জম্পেশ এক রাত কাটানো হয়েছে?

কোনো একদিন কি এলোমেলো লেখা হয়েছে? কোনো কাহিনি নেই, প্লট নেই। নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর তাড়া নেই। লেখাটা শেষ পর্যন্ত গল্প হয়ে উঠল কি না, এ নিয়ে বাগড়া দেবার ভয় নেই। একদম নিজের জন্য লেখা। ভুল বাক্য, ভুল বানান কিন্তু নিজে পড়লে মনে হবে একদম ঝরঝরে।

আস্ত একটা ট্রেন কিনতে ইচ্ছে হয়েছে কখনো? বগির ভেতর ঘর-সংসার হবে। সকালবেলা একটা ডিম সেদ্ধ, দুই পিস পাউরুটি। তারপর জানালার পাশ ঘেঁষে থাকা বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে গায়ে রোদ মাখানো। একটা-দুটো গল্পের বই পড়ে শেষ করা। দুপুরে গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত, দুটো আলু সেদ্ধ করে ভর্তা বানানো। তারপর ভাতঘুম। শান্তির ঘুম। ঘুম ভাঙুক শেষ বিকেলে। কোনো একটা অজানা ফুলের ঘ্রাণ আর রেশমি পাখির ডাকাডাকিতে। সন্ধের ঠিক আগে আকাশ লালচে হবে। ডিমের কুসুমের মতো সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়বে চারপাশে। এই আকাশ দেখতে দেখতে ঝাঁপ ফেলা হবে আঁধারে। নিকষ বিকট আঁধার। নিপাট ভদ্রলোকের মতো একটা চাঁদ বড়শি দিয়ে ঝুলিয়ে দেবে কেউ অনেক ওপরে। আর তারা। শয়ে শয়ে লাখে লাখে। তারা দেখতে দেখতে চোখ নিভু নিভু হবে। ঘড়িতে সেকেন্ডের কাঁটার টিকটিক আওয়াজ। ঘুমানো যাবে না। রঙিন টিভিতে একটা সাদা-কালো ছবি মাঝখান থেকে দেখা শুরু হবে। অত সময় তো নেই যে আস্ত মুভি দেখব। রাতে খিচুরি আর ডিমভাজি। এই জীবনই চাওয়া হয়েছিল। হয় না। আমার কেনাকাটার ক্ষমতা সামান্য। সীমিত আয়। চাইলেই তো আর সম্ভব নয় সব। তবে এই না পাওয়ার মাঝেও সুখ আছে। কষ্ট-কষ্ট সুখ।

একেকটা দিন তাই এই সব সুখের বিকিকিনি চলে। মনে পড়ে হলদে পাখির কথা। সেই তো বেনাপোলে। স্কুলে তখন ক্লাস থ্রি কি ফোর চলছে। জন্মের থেকেই মা অসুস্থ। কলকাতায় বারো ঘণ্টার একটা মেজর অপারেশন হবে। সবার ভিসা হলো কিন্তু আমার হলো না। বাবার সাথে থেকে গেলাম বেনাপোলের কাস্টমসদের কোয়ার্টারে। বাবা রাজস্ব কর্মকর্তা, তাই ঝামেলা ছিল না কোনো। প্রতিদিন সকালে সাঁতার শিখতে নামতাম পুকুরে। বাবাই

সাঁতার শেখাত। পঞ্চভুজের মতো একটা বেঢপ পুকুর। মাঝখানে কচি দুটো শাপলা ফুল। বাসায় ফিরেই বাবার অফিসে যাবার প্রস্তুতি। একটা ম্যাংগো জুস হাতে ধরিয়ে, দুপুরে কোথাও যাব, সেটা দেখিয়ে দিয়ে বাবা চলে যেতেন অফিসে। বসে বসে সারা দিন আমি কমিকসের বই পড়তাম। একলা বারান্দা। গুমোট গরম আর এক দুপুর। বিকেলটার জন্য অপেক্ষা করতাম। বাবা এসেই আবার যেত লন টেনিস খেলতে। এই সময়টায় হলদে পাখি হলুদ রঙের ফ্রক পরে সাইকেল চালাত। মনে হতো উড়ছে কেউ। এত সুন্দর দেখিনি আগে। সাইকেলের সাথে পেরে উঠতাম না দৌড়ে। আমি পিছে পিছে ঘুরতাম। মুগ্ধ হতাম। প্রতিদিন নতুন মনে হতো মেয়েটাকে। অল্প বয়সের ভালো লাগা। বাছুড়ে প্রেম। মা অপারেশন শেষ করে ফিরে আসে। ঘরের সবাই খুশি। ফিরবে বাড়ি। ছাড়া হবে বেনাপোল। আমার মন ভালো নেই। আমি কোয়ার্টারের ভেতর এলোমেলো ঘুরে বেড়াই। রাস্তায় সারি করে দাঁড়ানো ট্রাক দেখি। বাজার দেখি। মানুষ দেখি। আর দেখি হলদে পাখিকে। কাছে যাওয়ার সাহস হয় না। কথা বলার সাহস হয় না। বিকেলে চলে যাব। গাড়ি দাঁড়িয়ে সামনে। আমার গাড়িতে উঠলেই বমি হয়। তেলের গন্ধ সহ্য হয় না। অ্যাভোমিন গিলে উঠে পড়ি গাড়িতে। গাড়ি চলে। জানালা দিয়ে দেখি পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে হলদে পাখি। নাম জানা হয়নি। স্মৃতির কোটরে জমা হওয়া মেয়েটিকে কোনো দিন আমি নাম ধরে ডাকতে পারব না। কী আফসোস!

সেদিন কষ্ট পেয়েছিলাম। বয়স অল্প। অল্প বয়সের কষ্ট। তীব্র কিন্তু গভীর নয়।

ভুলে গিয়েছিলাম। এরপর অনেক দিন মনে কেউ দাগ কাটেনি। ভালো তো কতই লাগে! ছুটে বেড়ায় অনেকেই এদিক-ওদিক। আমার হলদে পাখি হয়ে ওঠে না কেউ। সকালে স্কুল। বাড়ি ফিরে আলুভাজি, মুগ ডাল দিয়ে পেট ভর্তি করে ভাত খাওয়া। তারপর ভাতঘুম। বিকেলে মাঠে গিয়ে বোমবাস্টিং, সাতচাড়া আর ক্রিকেট খেলা। এরপর গৃহশিক্ষক। পড়াশোনায় ভালো ছিলাম না। বিজ্ঞান, অঙ্ক ঢুকত না মাথায়। মার খেতে হতো খুব। নিষ্ঠুর ছিল লোকটা। স্টিলের স্কেল দিয়ে মারত। দাগ পড়ে যেত। বিরিয়ানি, লক্ষ্মী এমন সব নাম ছিল তার মারের। মেরেই আনন্দ পেত লোকটা। আমাকে পড়ানোর ব্যাপারে আগ্রহ ছিল কম। গৃহশিক্ষক চলে যাবার পর হাঁপ ছেড়ে বাঁচা। তারপর বই নিয়ে বসতে হতো টেবিলে, কিন্তু পড়ায় আর মন বসত না। পাঠ্যপুস্তকের ভেতর গল্পের বই নিয়ে পড়তাম। পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বসলেই ঘুমে জড়িয়ে আসত চোখ। ঠিক সাড়ে আটটায়

ভাত খেতে হতো। বাজে স্বাদের সবজি থাকত রাতে। এক গ্লাস দুধও খেতে হতো। দুধের গন্ধ সহ্য হতো না একদম। চোখ বন্ধ করে খেয়ে নিতে হতো। তারপর আর জেগে থাকা সম্ভব না। বাবার পাশে শুয়ে ঘুম। একা ঘুমাতে ভয় লাগত। চিরদিনই ভিতু আমি। রাতে বাজে স্বপ্ন দেখতাম। বোবা ভূতে ধরত। মা তাবিজ জোগাড় করে এনে দিয়েছিল। লাভ হয়নি।

এভাবেই চলে যাচ্ছিল দিন। ছন্দপতন হলো যখন ক্যাডেট কলেজের জন্য ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছি তখন। ক্লাস সিক্সের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। খুশি মনে ছুটি কাটানোর কথা। কিন্তু বাবা ভর্তি করে দিলেন বাংলাবাজারের 'গুরুগৃহ' কোচিংয়ে। প্রতি সকালে 'সকাল সন্ধ্যা' দোকানে নাশতা করাত। পরোটা আর মিষ্টি। নিজের মোটরসাইকেলে নামিয়ে দিত বাংলাবাজারে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পড়াশোনা। সাধারণ জ্ঞানের বই ঘাঁটানো। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি কোনটা, বড় সেতু কোনটা, কে কবে নোবেল পেয়েছিল–এই সব। মন্দ লাগত না একদম। বিজ্ঞান, অঙ্কের চেয়ে ভালো অনেক। এই কোচিংয়ে দেখা হয় আরেক হলদে পাখির সাথে। নাম জানা হয়। ঝুমুর। আমারই এক বন্ধুর সাথে তার ভালো সম্পর্ক। সমবয়সী মেয়েদের সাথে কথা বলতে পারি না। নার্ভাস লাগে। চোখের দিকে তাকানোর প্রশ্নই ওঠে না। মেয়েটা নিজে এসেই কথা বলে। আমি আশাবাদী হয়ে উঠি। কোচিংয়ে আসার আগে মাথার চুলগুলো এখন আর এলোমেলো থাকে না। সেখানে চিরুনি আর তেলের ছোঁয়া থাকে। জামার কলার, বোতাম, প্যান্টের বেল্ট সব দিকে কড়া নজর এখন। বাবা সাইকেল কিনে দিয়েছে। হারকিউলিস টপ গিয়ার। সাইকেল চালানোর সময় নিজেকে হিরো মনে হয়। ঘুরে বেড়াই কোচিং ফাঁকি দিয়ে নানান জায়গায়। ত্রিশ গোডাউন, কীর্তনখোলা গার্ডেন, দুর্গাসাগরসহ আরও নানান জায়গায়। পকেটে দশ টাকা থাকলেই হলো। দিন পার হয়ে যায়। শহরজুড়ে সবাই যেন প্রেম করছে। ভালোবাসা-বাসির শহর। প্রতিটি মেয়ের হাত ধরে আছে একটি ছেলে। ভালোই লাগে। ইশকুলে পড়া ছেলে। অত সাহস পোষায় না। আমি নতুন হলদে পাখির কাছে যাবার সাহস পাই না। মুখ ফুটে কথা বলবার সাহস পাই না। হলদে পাখি নিজেই কাছে আছে। একদিন কোচিং শেষে হাতে ধরিয়ে দেয় চিঠি। বাংলাবাজারের ছোট্ট এক গলির ভেতর সাইকেল থামিয়ে বলে, 'চিঠিটা পৌঁছে দিয়ো, প্লিজ।' আমি তার কথা রেখেছিলাম। চিঠি পৌঁছে দিয়েছিলাম। তার কাছের মানুষ, কাছের মানুষ আমারই বন্ধুর কাছে। ভালোবাসা হলো তাদের। আমি আড়াল হলাম। লুকোলাম। সেই ছোট্ট থেকেই লুকোচুরি খেলায় আমি সবার সেরা।

চুপচাপ কয়েক বছর। ক্রিকেট খেলি। ভালো খেলে নাম হয়েছে একটু। এদিক-ওদিক খেলতে যাই। টুর্নামেন্ট। টাকা পাওয়া যায়। পাওয়া যায় কম দামি মেডেল আর ক্রেস্ট। পড়াশোনা চলে ঢিমেতালে। বাবার ঝাড়ি, মায়ের উপদেশ বিরক্তিকর সব। বাড়ি উঠে গেছে দোতলা। লোনের টাকায় বাড়ি। ভাড়াটিয়া দরকার জরুরি। ভাড়াটিয়া আসে। এক তহসিলদারের পরিবার। সাত মেয়ে। সবাই মেধাবী খুব। আমি মায়ের কাছে, বোনের কাছে তাদের গল্প শুনি। তাদের সাথে কথা বলার কথা ভুলেও ভাবি না। জানা যায়, সাত মেয়ের একটি মেয়ে আমার বয়সী। সদর গার্লস স্কুলে পড়ে। আমি ব্যাট হাতে ঘর হতে বের হবার সময় দেখি বোনেরা মিলে ব্যাডমিন্টন খেলছে। আমার একমাত্র বোনটাও মিলে যায় ওদের সাথে। সে কী বন্ধুত্ব! খাতির! বাসায় প্রতি দুপুরে তরকারি আসে। কবুতরের মাংস আলু দিয়ে রান্না, নয়তো লাউ দিয়ে কই মাছ। এসব কিছুর ভেতরে আমিই বেমানান। হলদে পাখির সাথে কথা হয়। মাহবুবা নাম। একই ক্লাসে পড়ে। নোট আর গাইড বইয়ের জয়জয়কার সব জায়গায়। মেয়েটা আসে নোট করতে। পড়াশোনা নিয়ে কথা বলতে। কী সাবলীল! ক্রিকেট মাঠে সাহস থাকলেও এখানে মেয়েটার সামনে ভ্যাবাচেকা খেয়ে বোকার মতো পড়ে থাকি। তারপর বন্ধু হই। গল্প হয়। আড্ডা হয়। ব্যাডমিন্টন খেলায় একটামাত্র ছেলের প্রবেশাধিকার আছে, সে হলো আমি। মাহবুবা বন্ধুই থাকে। বন্ধুর চেয়ে খুব বেশি কিছু নয়। তারপর একদিন চলে যায়। ট্রাক ভর্তি করে মালামাল ওঠানো হয়। তার বাবার বদলির কারণে চলে যায়। যাবার আগে দেখা হয় না। প্রি-টেস্ট পরীক্ষা তখন। পরীক্ষা শেষে বাসায় এসে শুনি চলে গেছে সবাই। কেউ নেই। কিছু নেই। মাহবুবা কিছু রেখে যায়নি আমার জন্য। সামান্য চিরকুটও না। কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন। রাগে গোটা দুই মাটির টব ভেঙেছি। মাহবুবার ফুল পছন্দ ছিল। মাটির টবে তার ফুলগাছ। নিয়ে গিয়েছে সব। যা রয়ে গেছে, সব আমার। তার জন্যই কিনেছিলাম। বলা হয়নি। আমিও ফুল নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছি, বুঝিয়েছি এটা। অযথা।

তারপর কলেজ। বিশ্ববিদ্যালয়। ছোঁয় না কেউ। নিজেও কাউকে কাছে আসতে দেই না। আমি হলদে পাখিদের নিয়ে থাকি। আমার নিজের জগতে ত্রিচারিণী হয়ে উঠি। কোনো দিন মাহবুবাকে নিয়ে ঘোরা হয়। কোনো দিন ঝুমুর, আবার কোনো দিন নাম না জানা মেয়েটি। আমার মতো তাদেরও বয়স বাড়ে কল্পনায়। জানি না এ কোন জীবন! এ কোন ভালোবাসা, প্রেম! আমি ক্লান্ত, অসুস্থ কিন্তু সুখী।

পুরুষরা এবং নারী

মেয়েটাকে ধর্ষণ করা হচ্ছে।

পূর্বা সরকার ফিল্ম বানাতে চায়। মেয়ে হয়ে কী অদ্ভুত ইচ্ছে! মেয়েরা চাকরি করলে হবে শিক্ষক, চিকিৎসক। ফিল্ম-টিলিম ছেলেদের জন্যই নিষেধ আছে। মেয়েদের জন্য তো একদম হারাম।

পূর্বা এসবের ধার ধারে না। সে ফিল্মই বানাবে। গোঁ ধরে আছে মেয়েটা। তার জন্য শুভকামনা।

আপাতত সে একটা টিভি চ্যানেলে চাকরি করছে। ফিল্ম বানাতে হাজারো ঝক্কি। সবাই আশার কথা শোনায়, কিন্তু সাহায্য করে না। পূর্বা বসে নেই। সে চাকরি করছে। বিয়ে করেনি। জেদ ধরে বসে আছে। মেয়ে হলেই একটা নির্দিষ্ট বয়সের ভেতর বিয়ে করে ফেলতে হবে, এসবে সে বিশ্বাস করে না। জেদি মেয়ে। মা-বাবা আগে এটা-ওটা বলত। এখন আর ঘাঁটায় না।

শুটিং আজ। একটা ডকুমেন্টারি টিভির জন্য। ইউনিট নিয়ে আসা হয়েছে গ্রামের দিকে। শীতটা দারুণভাবে উপভোগ করছে পূর্বা। পায়ে লেগে আছে তার সকালের সোনালি রোদ, কাঁচা-পাকা ঘাস, ধুলো, কাদা, ভেজা শিশির। ফোলা ঘুমো চোখে সবকিছু রঙিন, স্বচ্ছ পানির মতো। একটু শীত-শীত হাওয়া কাপড়, সুতোর ফাঁক গলে শরীর ছোঁয়। দু-একটা পাখি পালক ঝাড়ে, ঠোঁট দিয়ে ঠোকরায় এলোমেলো গাছে, আকাশে, পাতার সবুজে। নারকেলের খোল দিয়ে বানানো গাড়ি, সুপারি পাতার আংটি আর লাল টেপে পেঁচানো টেপ টেনিস বল নিয়ে তুলকালাম গ্রামের শৈশব। ঝিলিক দেওয়া সূর্যের আলোয় এক দলা রোদ্দুর সকাল থেকে ঘড়ির কাঁটায় দুপুরের দিকে ঝাঁপ দেয়। অনেক কাজ। কিন্তু আলসেমি লাগে। গত রাতের কথা মনে হয়। শীতের কথা মনে হয়।

শেষ রাতে পূর্বা কাঁথা টেনেছিল গায়ে। শীত। এ সময় কেমন গুটিসুটি মেরে শামুকের মতো হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

শৈশবে তার দাদু এ সময় বলতেন দল (পুরু) কাঁথা গায়ে দিতে। বলতেন, 'শোন, এই হাওয়া ভালো না। জ্বর, অসুখ হয়।' শোনার সময় কই!

তখন বাস করা হয় রূপকথার সময়ে। স্বপ্নে আসে ব্যাঙ রাজকুমার, জলপরি। চোখে পিঁচুটি নিয়ে কুয়াশার শরীর চিড়ে উঠোনে গিয়ে বসা হয় সকালে। খড়কুটো জ্বালিয়ে নেওয়া হয় ওম-ওম গরমের আরাম। পূর্বার মা দিয়ে যেত খই কিংবা গরম গরম মুড়ি ভাজা। সাথে থাকত গুড়। কপাল ভালো থাকলে দাদুর কল্যাণে জুটে যেত ভাপা পিঠা, কুয়ো পিঠা কিংবা লাঠি পিঠা। পূর্বার বরাবর ভাতই পছন্দ। তিন বেলা ভাত লাগবেই লাগবে। ভাত, মুগের ডাল আর ছোট চিংড়ি দিয়ে আলুভাজা। পেটের শান্তি!

কোনো এক ঘরে পড়ুয়া কে যেন আবার পড়ত, 'ত্রিভুজের তিন বাহু...তিন বাহু।' দুষ্টের দল পূর্বা আর তার বান্ধবীরা হাসত। পড়াশোনা করে বোকারা। ওসবে থাকলেই মজা মাটি। শীতের আমেজ কেটে সূর্য উঠতে উঠতে সেই দুপুর! তার আগেই মায়ের আদেশ টিউবওয়েলের পানিতে করে নিতে হবে গোসলটা। শীতে অই টিউবওয়েলের পানিটাই যা একটু গরম। পুকুরের পানি তো বরফ শীতল! তার ওপর জানা নেই সাঁতার। ভীষণ শাস্তি।

শীতের কথা মনে করে পূর্বা ওড়ায় ভাবনার এলোমেলো জরি। শৈশব নিয়ে ভাবনা। ভাবনা একসময় থামে। ফুঁস মন্তর ফুঁ-এর মতো হাওয়ায় মিলায়। কত কাজ!

এসব নিয়ে ভাবলে চলে?

কখনো পেশাদার হতে চায়নি পূর্বা। সময় তাকে পেশাদার বানিয়ে দেয়। ভাবনাকে ছুটি দিয়ে সে কাজে নামে।

হায় শীত, হায় জীবন!

গ্রাম ছাড়িয়ে আরও ভেতরের দিকে যাওয়া হয়। প্রকল্প এলাকার এদিকে সরু রাস্তা। একদিকে ধানখেত, আরেক দিকে নদী। নদীতে জল বলতে নেই। শুকিয়ে যাওয়ায় জল ফুঁড়ে বের হয়ে এসেছে মাটি আর বালির শরীর। নদীটা ভরাট করা হবে। বালি ফেলা হবে দেদার। পঁচিশ ফুট করে বালি ফেলার পরিকল্পনা আছে। এখন ইট আসছে। প্রতিদিন এক লাখ ইট ফেলা হচ্ছে এখানে। ট্রাক আসছে। শ্রমিকেরা কাজ করে যাচ্ছে। অনেক বড় এলাকা। সে তুলনায় শ্রমিক সামান্যই। আওয়াজ নেই একদম। প্রকল্প এলাকায় নীরব চারপাশ এই সাতসকালেও।

পূর্বার সাথে থাকা ক্যামেরাম্যানটা ট্রাইপড বের করে। লেন্সগুলো ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। লিবেকের ট্রাইপড। নতুন কেনা। আরাম করে

শুটিং শুরু করে ক্যামেরাম্যান। লোক বেশি আসেনি সাথে। ক্যামেরাম্যান আর একজন স্ক্রিপ্টরাইটার সাথে। স্ক্রিপ্টরাইটার ছেলেটা লিখে ভালো। গল্পের হাত ভালো। বিভিন্ন পত্রিকায় টুকটাক লিখে। জনপ্রিয়তা পাওয়ার, লেখক হবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটাকে পূর্বার পছন্দ। নিজের ফিল্মটা নিয়ে সে ছেলেটার সাথে বসতে চায়। এখনো সাহস করে উঠতে পারেনি। সময় লাগবে। এই তিনজনই তারা। শহর থেকে এত দূরে অন্য কাজ ছেড়ে কেউই আসতে চায়নি আজকের অ্যাসাইনমেন্টে। সাথে আছে প্রকল্পের দেওয়া একটা জিপগাড়ি। গাড়ির অবস্থা ভালো না। একটু পরপর স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। কাদায়, বালিতে আটকে যায় চাকা। ড্রাইভারকে রীতিমতো সংগ্রাম করতে হয় গাড়িটাকে চালু রাখার জন্য। পূর্বার খারাপ লাগে না। এই এমন দূরের কোনো জায়গায় এসে কাজ করা চ্যালেঞ্জ মনে হয়। তার চ্যালেঞ্জ নিতে ভালো লাগে। যদিও এটা একটা অনুরোধের কাজ। চ্যানেল-মালিকের বন্ধুর প্রকল্প। ভালো ভালো কথা বলে একটা ডকুমেন্টারি বানাতে হবে। এই ভিডিও খবরে, নানান জায়গায় দেখিয়ে কাস্টমার ধরা হবে।

কাজ শুরু করে পূর্বা। শ্রমিকদের সাথে কথা শুরু করে। সবাই কাজে নামেনি। কেউ কেউ ভাত খাচ্ছে। প্রকল্পের লোকজন এলেই সবাই তাড়াহুড়ো শুরু করে।

পূর্বা তার ক্যামেরাম্যান নিয়ে চলে এসেছে আগে। এস্টাব্লিশমেন্ট শটগুলো নিয়ে নিচ্ছে। সূর্য, আকাশ, মেঘ, ট্রাক, সিমেন্টের বস্তা, গাড়ির চাকা এসব সিম্বলিক শটও বাদ পড়ছে না। প্রকল্পের দুজন লোক আসতেই সবাই কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। তারা খুব বেশি কথা বলে না। এই নির্জনতা অবাক লাগে। খুব বেশি শান্ত গ্রাম থেকে এই দূরের জায়গাটা। বাতাসেরও শব্দ নেই। মাঝে মাঝে পূর্বার অ্যাকশন, কাট বলাটাই যেন অনেক বেশি আওয়াজ এখানে।

শ্রমিকদের চোখ-মুখ দেখে মনে হয় প্রকল্পের লোক দেখে তারা আতঙ্কে আছে। ভিতু সবাই। শ্রমিকের সংখ্যা চব্বিশ। প্রকল্পের লোকজন থেকে জানা যায় তাদের বিষয়ে তথ্য। মাস ছয়েক ধরে তারা এখানেই আছে। তাদের খাবার, কাপড় সব গ্রাম কিংবা শহর থেকে ট্রাকে করে আনা হয়। লোকালয়ের সাথে অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ নেই লোকগুলোর। ছুটিছাটারও সুযোগ নেই। কাজ শেষ হলেই মুক্তি। রীতিমতো টর্চার যেন। অল্প কিছু টাকার জন্য পড়ে আছে এখানে লোকগুলো। এখানেই খাওয়া, ঘুমানো, থাকা সবকিছু। পূর্বার মায়া হয়। মানবেতর জীবন বৈকি!

'প্রকল্পের কাজ কত দূর?' পূর্বা জিজ্ঞেস করে একজন শ্রমিককে। দু-একজনের ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। প্রকল্পের কাজ নিয়ে কথা জানতে চাওয়া হবে। কীভাবে তরতরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এই প্রকল্পের কাজ, সেটা বোঝানোর জন্য শ্রমিকদের কথা শোনা উচিত। এতে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ে।

পূর্বা শ্রমিকদের সাথে খাতির জমানোর চেষ্টা করে। তাদের সাথে সহজ হলেই সুন্দরভাবে শুটিংটা করা সম্ভব। ক্যামেরা দেখলেই বোকাসোকা গরিব লোকগুলো ভয় পাচ্ছে। ক্যামেরা বন্ধ করেই তাই কথা হয় সামান্য।

'ভালা। ভালা। সব ভালা।' বলে এক শ্রমিক। তারপর কাজে মন দেয়।

'বিয়ে করছেন?' আলাপ অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করে পূর্বা। এটা একধরনের কৌশল। এই সব গরিব লোক বউ-বাচ্চা নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করে। তা ছাড়া এই শ্রমিকের বয়স অল্প। সদ্য বিয়ে করেছে হয়তো। এ সময় বউ ছাড়া অন্য কিছু মাথায় ঢোকে না। সুযোগটা তাই নেওয়া দরকার। বউ নিয়ে কথা বলতে বলতে হুট করে প্রকল্পের কথায় ঢুকে যাওয়া যাবে। ক্যামেরাম্যানকে বলে দেওয়া আছে। ক্যামেরা যে চলছে, সেটা বোঝার উপায় নেই। বলা যায় গোপনেই দৃশ্যধারণ। অতিরিক্ত, এলোমেলো যে কথা থামবে, তা এডিটিং এ বসে কেটে ফেলে দেওয়া হবে।

কেউই সাবলীল ভাবে কথা বলে না। নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিছু জিজ্ঞেস করলেই 'ভালা। সব ভালা।' বলে এড়িয়ে যায়।

বোঝা যায় তাদের কথা বলায় প্রকল্পের লোকজনের নিষেধ আছে। নইলে এতগুলো মানুষ একই কথা বলতে পারে না। সব শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়া যেন। দুপুরে পূর্বাদের খাবার আলাদা করে আসে। এক প্যাকেট বিরিয়ানি। প্রকল্পের লোকেরা তাদের সাথেই খায়। তারপর গাড়িতে করে চলে যায়। সাথে যায় সকালে আসা জিপ গাড়িটাও। দুপুরের পর আর কোনো যানবাহন আসে না এদিকে। তখন লোকালয়ের মানুষের সাথে যোগাযোগ করা অসম্ভবই বলা চলে। প্রকল্পের লোকেরা সন্ধের আগেই গাড়ি নিয়ে আসবে বলেছে। পৌঁছে দেবে পূর্বাদের গন্তব্যস্থলে। শ্রমিকদের সাথে বেশি মেলামেশা করতে নিষেধ করেছে। ছোটলোকের তো ঠিক নাই।

ঢিমেতালে চলে শুটিং। কোনো রকমে ত্রিশ মিনিটের ফুটেজ পেলেই হলো। সেটাকে কেটে দশ মিনিটে নামানো হবে। শ্রমিকদের সাথে কথা বলার ব্যাপারে হাল ছেড়ে দেয় পূর্বা। সে বালির ওপর বসেই ভাবে নিজের

ফিল্মটার কথা। স্ক্রিপ্ট বারবার বদলানো হচ্ছে। প্রতিটা দৃশ্য নিয়ে ভাবতে হবে। কোনো কম্প্রোমাইজ নয়। শিল্পে কম্প্রোমাইজ চলে না। এবার ফিরেই সরকারি অনুদান পাবার চেষ্টা করতে হবে। দু-একজন বড় মানুষকে লাগবে লবিংয়ের জন্য। পূর্বা স্বপ্ন দেখে জেগে জেগে। এতে দোষ নেই। কারো ক্ষতি হয় না। যা ক্ষতি শুধু নিজেরই।

দুপুর, বিকেল একসময় সন্ধে হয়। প্রকল্পের লোকজন আসে না। কোনো গাড়ি দেখা যায় না।

গল্প শেষ করতে হবে। বেশি ডিটেইলে যাওয়া যাবে না। আসল কথা, কয়েক লাইনে বলে ইতি টানতে হবে। লেখকের তাড়া আছে। সে বুঝেছে, এটি মহৎ কোনো শিল্পকর্ম হতে যাচ্ছে না। পূর্বার পেছনে সময় দেওয়াটা অপচয় হবে। একটা দায় ছিল, সেটা মেটাতে হবে, তাই এত শব্দের হুড়োহুড়ি। গল্প লেখার চেষ্টা।

রাত নামে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটা-দুটো কুপিই জ্বলে শুধু। তাও নিভু নিভু শিখা বাতাসের ভয়ে ভীত। যেকোনো সময়ে নিভে যাবে এমন। পূর্বার ভয় করে। সে ভয় পায়। তার সাথে আসা উঠতি লেখক, স্ক্রিপ্ট রাইটারও ভয় পায়। ক্যামেরাম্যান ভয় পায় না। তার সাহস আছে। সে খোঁজ নিয়ে জানার চেষ্টা করে প্রকল্পের লোকদের না আসার কারণ। বোঝা যায়, কোনো একটা অঘটন ঘটেছে। গাড়ি বিগড়েছে বা অন্য কিছু। নইলে ঠিক ঠিক সময়েই আসার কথা ছিল গাড়ি নিয়ে। এখন আসতে দেরি হবে। ঝামেলা শেষ করে কাল কিংবা আজকে মাঝরাত।

বালির রাজ্যে ছাব্বিশ জন পুরুষ আর একটি মেয়ে। মেয়েরা অনেক কিছু আগে আগেই বুঝতে পারে। পূর্বা বোঝে সে নিরাপদ নয়। সে ভগবানকে ডাকে। লাভ হয় না।

একসময় আগুন নিভে যায়। কুপির আলো আর জ্বালানো হয় না। ঘুটঘুটে অন্ধকারে পূর্বা তার শরীরে একের পর এক পুরুষের দেহ উঠে আসা টের পায়। পূর্বা চিৎকার করে, কাঁদে। ক্যামেরাম্যান আর স্ক্রিপ্ট রাইটার তাকে বাঁচাতে আসে না। চব্বিশ জন শ্রমিকের ভেতর তারা অসহায়। অন্ধকারে কিছু ঠাওর করা যায় না। অন্ধকারে চব্বিশ জন পুরুষ একসময় ছাব্বিশ হয়। নারীদেহ বলে কথা। অন্ধকারে সুযোগ না নেওয়াটাই বোকামি। ভগবানকে ডাকতে ডাকতে পূর্বা জ্ঞান হারায় একসময়, আর ছাব্বিশ জন পুরুষ নিজেই একেকজন ভগবান হয়ে ওঠার

গর্বে গর্বিত হয় কিংবা ভগবানকে টেক্কা দেওয়ার শান্তিতে হেসে ওঠে অন্ধকারে। সে রাতের গল্প এতটুকুনই।

সমগ্র পুরুষজাতিকে দোষ দিয়ে এ গল্প আপাতত এখানেই শেষ করা হলো। শুধু বলা থাকুক, পূর্বা বাঁচেনি। এত ধকল তাকে বাঁচতে দেয়নি। ভালোই হয়েছে। আরেকটা কথা উঠতি সেই লেখক, স্ক্রিপ্টরাইটার এখন মোটামুটি জনপ্রিয়ই। লেখার মধ্য দিয়ে পাপ মোচন হয়। তাই সে গল্পটা লিখে। এ গল্পটা পূর্বাকে উৎসর্গ করা। ভুল তো পুরুষের হয়ই। একটা ভুল করেছে সে। সে ভুলের জন্য ক্ষমা প্রয়োজন। লেখক ক্ষমা চায়। দায় এড়ানোর ক্ষমা!

পূর্বা ওপারে ভালো থাকুক। লেখক এপারে ভালো আছে। খুব ভালো আছে।

ছি!

আলাদিন

আলাদিন একটু পর হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মারবে নুসরাতের মাথায়।

এখন সকাল। মেঘের আড়াল থেকে মাত্র উঁকি দিয়েছে সূর্যটা। সকাল থেকেই আকাশে জট পাকিয়ে ছিল মেঘ। তারপর ঝুম বৃষ্টি। আকাশ চিরে হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নেমেছিল পথে। ভোলার দৌলত খাঁ, বোরহানউদ্দিন এলাকাগুলো ভিজে একাকার। ভিজে ভিজে গাছ, লতাপাতা আরও বেশি হয়েছে সবুজ।

হংরাজ লঞ্চ সকাল সকালই ঘাটে ভিড়েছিল। যাত্রীরা ভীত ছিল। প্রচণ্ড ভয়ে ঘাটে নেমে অনেকেই হড়হড় করে বমি করেছে। বাচ্চারা কেঁদেই যাচ্ছিল। নরক অবস্থা। নদীতে তেমন একটা ঢেউ হয়নি। ঝোড়ো হাওয়াও ছিল না। বৃষ্টি হয়েছে যা একটু। যাত্রীরা কেন এমন আতঙ্কিত হয়েছে কে জানে! এ রুটে যারা নিয়মিত যাতায়াত করে, তাদের এত অল্পতে আতঙ্কিত হবার কথা নয়।

এই লঞ্চেই এসেছে আলাদিন। মানুষ হিসেবে সে ভিতু। জলে ভীষণ ভয়। মাটিতে পা রেখেই শান্তি। অনেক দিন বাঁচার ইচ্ছে আলাদিনের। এত তাড়াহুড়ো করে মরার ইচ্ছে নেই।

লঞ্চ থেকে নেমেই নুসরাতের বাড়িতে চলে এসেছে আলাদিন। সকাল সকাল আলাদিনকে দেখে অবাক হয়েছে নুসরাত। গত ছয় মাস ধরে লোকটা আসা-যাওয়ার মাঝেই থাকে। নুসরাতের স্বামীর সাথে চুটিয়ে আড্ডা দেয়। নুসরাতের বাচ্চাটার জন্য এটা-ওটা কিনে নিয়ে আসে।

প্রথম দিকে নুসরাত অল্প বিরক্ত হতো। আসতে নিষেধ করলেও আলাদিন শুনত না। একসময় হাল ছেড়ে দিয়েছে নুসরাত। সে জানে, আলাদিন ভিতু বটে কিন্তু একইসাথে নাছোড়বান্দা। এই নির্বিষ লোকটাকে দিয়ে কোনো ক্ষতি হবে না। আর যেহেতু তার স্বামী আলাদিনের সঙ্গ পছন্দ করছে, তাই তাকে নিয়ে আর খুব বেশি ভেবে লাভ নেই। বাড়িতে এলেই আলাদিন অনেক কিছু নিয়ে আসে। উপহার আরকি। এসব খারাপ তো নয়।

আলাদিন আসে আর যায়। নুসরাতের স্বামীর সাথে সন্ধ্যার দিকে আড্ডা দেয়। রাত অবধি চলে আড্ডা। প্রায় প্রতিদিনই বাইরে থেকে খাবার

নিয়ে আসে আলাদিন। গলা অব্দি গিলে জোর গলায় কথা বলতে থাকে আলাদিন আর নুসরাতের স্বামী হাবিব।

আলাদিনের সাথে প্রেম ছিল নুসরাতের। ছোট্টবেলার প্রেম। সেই একদম ল্যাদা ছিল তখন থেকে। আলাদিনের বাবার তখন রড-সিমেন্টের ব্যবসা। শেখেরটেক ছয় নম্বরে চারুলতা ফ্যাশনের অপজিটে দেড়শো স্কয়ার ফিটের ছোট্ট একটা দোকানে বসতেন আলাদিনের বাবা হাবিব সাহেব। তিনি তখন সাহেব ছিলেন না। কাস্টমাররা তাকে বলত হাইববা অথবা হাবি মিয়া।

হাবিব সাহেব ব্যবসাটা বুঝতেন। বাবার কাছ থেকে কিছু পাননি। শূন্য থেকে শুরু করেছেন। অল্প বয়সে বিয়ে করেছিলেন। কঠিন দায়-দায়িত্ব ছিল মাথার ওপর। হালকা-পাতলা রাজনীতি করতেন। এই রাজনীতিটা তার জীবন বদলে দিয়েছে। তিনি রাজনীতি নিয়ে থিতু হননি। ওসব তার পোষায় না। তিনি বলতেন, 'ধুর, রাজনীতি-ফাজনীতি বুঝি না। ট্যাকাই মরণ। ট্যাকাই জীবন।'

এই যে যে টাকার প্রতি তার লোভ, ভালোবাসা–এর জোরেই তিনি অনেক দূর গিয়েছেন। রাজনীতির প্রভাব খাটিয়ে একের পর এক কাজ এনেছেন। জমে উঠেছিল রড-সিমেন্টের ব্যবসা। এলাহি কারবার বলা চলে। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে এলাকা ও এলাকার বাইরের সব রাস্তা-কালভার্ট-ব্রিজের রড-সিমেন্ট তিনি সাপ্লাই দিয়ে কোটি কোটি টাকা বানিয়েছেন।

টাকা একবার আসা শুরু করলে আসতেই থাকে। হাবিব সাহেব টাকার মূল্য বুঝতেন। পাঁচ বছরের উপার্জন দিয়ে আরামে জীবন পার করে দেওয়া যেত। কিন্তু হাবিব সাহেব নতুন নতুন ব্যবসায় হাত দিয়েছেন। আলাদিনের মনে পড়ে, তার বয়স যখন দশ কি বারো, তখনই তার বাবা ব্যবসার ব্যাপার-স্যাপার তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতেন। বলতেন, 'ট্যাকা কঠিন জিনিস। তারে চুপচাপ রাইখা দিতে হয় না। ট্যাকার পাখনা আছে। উড়াল দিবো। ট্যাকা খাটাইতে হইবো। ট্যাকা দিয়া আরো ট্যাকা আনতে হইবো। তইলেই না জীবন সার্থক।' আলাদিন এসব বোঝেনি। টাকা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। সে তার বাবার বড় হওয়া দেখেছে। ভেসপা থেকে বিএমডব্লিউ নিয়ে ঘুরে বেড়ানো সবই তার চোখের সামনে হয়েছে। ইট-বালু-সিমেন্ট থেকে শুরু করা ব্যবসা গার্মেন্টস অবধি গিয়েছে।

হাবিব সাহেব নারায়ণগঞ্জে দুর্গের মতো বাড়ি বানিয়েছেন। তিনি সেখানেই থাকতেন। পড়াশোনা বেশি করেননি, তাই বেশি জানেওয়ালা লোকজন এড়িয়ে চলতেন। তার ব্যবসায় এসব লোকের দরকার ছিল না। নিজের ব্যবসার সবকিছু নিজেই দেখাশোনা করতে পছন্দ করতেন হাবিব সাহেব। দান-খয়রাত পছন্দ ছিল না। তিনি বলতেন, 'কাম করো মিয়ারা। খ্যামতা থাকলে আমার ফেক্টরিতেই চাকরি পাইবা। আর না হইলে না খাইয়া মরণ। আমার ট্যাকা আছে মানেই কি হুদামুদা সবাইরে বিলামু ?'

হাবিব সাহেব পরিবারকে সময় দিতে পারতেন না। পরিবার বলতে শুধু আলাদিনই ছিল। আলাদিনের গরিব মা সারা দিন ঘ্যানঘ্যান করত। হাবিব সাহেব তাকে টাকাপয়সা দিয়ে ভাগিয়েছেন। তালাক দিয়েছেন। একজন উত্তরাধিকার দরকার, তাই আলাদিনকে রেখে দেওয়া হয়েছিল। হাবিব মিয়া আর বিয়ে করেননি। নারীজাতির তার আকর্ষণ কম বলেই জানত সবাই। সবাই তাই প্রশংসা করত। যত মহাপুরুষই হোক না কেন, নারীকে এড়ানো সহজ কথা নয়। হাবিব সাহেব তাইতো সফল হয়েছেন। লোকজন এই ধনী ব্যবসায়ীকে নিয়ে এমন করেই ভাবত।

সব ভাবনা বদলে যায় হাবিব সাহেব খুন হবার পর। রাতারাতি তিনি ভালো মানুষ থেকে ভিলেনে পরিণত হন। জানা যায়, তিনি ব্যাংকে টাকা রাখতে পছন্দ করতেন না। ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্য অল্প কিছু টাকা রাখতেন ব্যাংকে। বাকি সব তার দুর্গের মতো বাড়ির সিন্দুকগুলোয়। মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে এসব। সিন্দুকভর্তি টাকার অপূর্ব সুন্দর ছবিও দেখতে পান সাধারণ জনগণ। রক্তমাখা লাশ তার পাশে টাকার বান্ডিল। টাকার এমন সুন্দর ছবি সচরাচর দেখা যায় না। টাকা সুন্দর, হোক না সে সামান্য রক্ত মাখানো তা-ও।

নারীজাতির প্রতি লোকটার ভয়ংকর আকর্ষণের ব্যাপারেও জানাজানি হয়ে যায়। ফ্যাক্টরির অসহায় নারীদের সুযোগ নিতে তিনি ভুলতেন না। এসব চলত গোপনে। তিনি দারুণভাবেই সব গোপন রাখতে পেরেছিলেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত।

ধনী নারীদের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল না। তাদের না ঘাঁটানোর আরও একটি কারণ হলো, এসব মেয়েরা বিপজ্জনক হয়। সব ফাঁস করে দেবার ভয় দেখাতে পারে। তাদের ভয়ডর কম। শরীর নষ্ট করলেও সমস্যা হয় না। অশিক্ষিত, গরিব মেয়েমানুষের ক্ষেত্রে এসব সমস্যা ছিল না। টাকা দিয়ে, জীবন আর সমাজের ভয় দেখিয়ে তাদের আটকে রাখা গিয়েছিল সহজেই।

মৃত্যুর পরই যত সব ঝামেলা শুরু হয়। ফরফর করে সব ঘটনা বলতে শুরু করে মেয়েগুলো। মিডিয়া সুন্দর করে তাতে অনেক বেশি রং চড়িয়ে মানুষের সামনে নিয়ে আছে। সবাই জেনে যায় হাবিব মিয়ার রঙচঙে জীবনের গল্প।

আলাদিন এসব জানত। সে তার বাবাকে কাছে পায়নি। কাছে পায়নি মাকেও। বাবা ব্যস্ত থাকতেন কাজে। আর মাকে তো তাড়িয়েই দেওয়া হয়েছিল। নিষেধ ছিল বাসায় আসা। মাসোহারা পেয়ে মা আর আসার সাহস করতেন না। ইচ্ছেও হয়তো ছিল না। ছেলেকে নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই বলেই আলাদিনের ধারণা।

ছোটবেলা থেকেই আলাদিন একা। বড় হয়েছে কাজের লোকদের কাছে। নিজেকে গুটিয়ে রাখতেই ভালো লাগে ছেলেটার। কারো সাথে মিশতে ইচ্ছা করত না। চুপচাপ একাই ভালো। মানুষের মাঝে এলেই লজ্জা যেন। এক কাজের বুয়া তাকে উদ্দেশ করে মাঝে মাঝে মজা করে বলত, 'আলাদিন ভাইজানের মাইয়া মাইনষের লাহান শরম। ছ্যা।' আলাদিনের এসব শুনে মন খারাপ হতো। সে আরো বেশি বাইরের দুনিয়া থেকে লুকিয়ে রাখত নিজেকে। একা একটা ঘরে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত পার করতে তার খারাপ লাগত না।

ভালো লাগলেও উপায় ছিল না ঘরে থাকার। স্কুল, কলেজে যেতেই হতো। সেখানে সবাই মজা করত তাকে নিয়ে। স্কুল কামাই আর কত দিন! সব সহ্য করত আলাদিন। সব যন্ত্রণা। এই মস্ত পৃথিবীতে নিজেকে তার বেমানান মনে হতো। এই জায়গাটা যেন তার নয়। এখানকার সবকিছুই কেমন যেন চাঁছাছোলা।

নুসরাতের সাথে আলাদিনের পরিচয় হয় কলেজে থাকতে। নুসরাতের টাকার প্রতি লোভ। এটা-ওটা কেনার শখ। আলাদিনকে ধনী ছেলেপেলেদের সাথে পড়ানোর ব্যাপারে আপত্তি ছিল হাবিব সাহেবের। কম দামি স্কুল-কলেজে তাই গিয়েছে আলাদিন। নুসরাতরা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের। শখ পূরণের উপায় ছিল না মেয়েটার। নুসরাত তাই গোবেচারা আলাদিনের বন্ধু হয়। তাদের প্রেম হয়। প্রেম বলতে আলাদিনের নুসরাতের জন্য এটা-ওটা কিনে দেওয়া আর আলাদিনের সাথে থেকে নুসরাতের সময় পার করা, এইতো।

নুসরাতের কথা শোনার ধৈর্য প্রবল। চুপচাপ আলাদিন নুসরাতকে পেয়ে কথা শুরু করে। দুনিয়ার কথা। এত কথা জমা ছিল তার ভেতর কে জানত!

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ছেলের হাতখরচের ব্যাপারে দিলদরিয়া ছিল হাবিব মিয়া। অতটুকুনই যেন ছিল পিতার দায়িত্ব, পুত্রের জন্য আদর। টাকা পেত বলেই নুসরাতকে দিত আলাদিন। টাকা দিয়ে তার কাজ কী!

তা প্রেম হয়ে গেল। হয় এসব। একটা বয়সে হরমোন-টরমোনের কারণে আবেগ নাকি বেশি থাকে। নুসরাতই বলেছিল, 'আলাদিন একসাথে আছি সারা জীবন। নো টেনশন।' একসাথের থাকার ইচ্ছে হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। টাকাপয়সার ঝামেলা নেই, যখন যা ইচ্ছে কিনে নেওয়া–এর নিশ্চয়তা কজন দিতে পারে, শুনি?

প্রেম হলেও বিয়েটা আর হলো না। নুসরাত বড় হলো, কিন্তু আলাদিন আর বড় হলো না। সেই এক বাচ্চাদের মতো আচরণ। সারা দিন এটা-ওটা গল্প বলা। কোনো আদর-সোহাগ নেই। ছেলে আর মেয়েদের মাঝে এসব না হলে চলে নাকি! অনেকবার আলাদিনের ঠোঁটে চুমু খেয়েছে নুসরাত। আলাদিনের কোনো বিকার ছিল না। কেমন শীতল সব। অল্প কাপড় পরেও আসা হয়েছিল সামনে। লাভ হয়নি। এসব নিয়ে আলাদিনের ভাবনা নেই।

জীবন নিয়ে বাজি ধরতে রাজি নয় নুসরাত। সে বুঝেছে, টাকাই সব নয়। শরীরেরও চাহিদা আছে। সুন্দরী মেয়েদের পাত্রের অভাব হয় না। এক সরকারি চাকরি করা ইঞ্জিনিয়ার তাকে বিয়ে করে। ভালোই কামায় তার বর। ঘুষ নিয়ে একদম রমরমা অবস্থা। বিয়ের এক বছরের মাথায় একটা বাচ্চাও নিয়ে নেয় নুসরাত। সুখের সংসার। আলাদিনকে মনে রাখার সময় নেই। আলাদিন মনে রাখার মতো কিছু না।

নুসরাতের বর বিয়ের বছর বরগুনা ছিল, তারপর বদলি হয়ে ভোলায় আসে। ভোলায় বসেই পত্রিকায়, টিভিতে জানা যায় আলাদিনের বাবার খুন হবার খবর। তার ব্যবসায় অংশীদার নেওয়া লোকগুলো বিরোধের কারণে তাকে খুন করে। নোংরা কাহিনিগুলো বের হয়ে আসে। শুনে গা রি রি করে ঘৃণায়। তখন আলাদিনের কথা মনে পড়ে।

এই জন্য না যে বেচারা বাবাকে হারিয়ে কী বিপদেই না আছে এখন, বরং এই জন্য যে ছেলেটার অনেক টাকা, সেটা কীভাবে খরচ হবে, সেই কথাটা ভেবে। নুসরাতের পেটে আবার বাচ্চা আসে। নুসরাতের বর বাচ্চা আনার ব্যাপারে পটু খুব। নুসরাত প্রথম দিন দেখেই বুঝেছিল। নুসরাত ভালো আছে। খুব। এই ভালো থাকার পরিমাণটা আরো বাড়িয়েছে আলাদিন।

আলাদিন ভোলায় এসেছে খুব বেশিদিন হয়নি। সকালবেলা একদিন বাজারের দিকে যাচ্ছিল নুসরাত। বাসার কাঁচাবাজার সব নুসরাতই করে।

দোকানদারের সাথে দরদাম করতে ভালোই লাগে। এমনই দরদাম করার সময় দূর থেকে তার ওপর নজর রাখা এক লোকের দিকে চোখ পড়ে। নুসরাত চালাক মেয়ে। তার বুঝতে দেরি হয় না যে এটা আলাদিন। সে অবাক হয়। কদিন ধরে নজর রাখছে কে জানে! আলাদিনের বয়স বেড়েছে। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে ঢেকেছে মুখ, তবু চেনা যায়। কেমন এক অদ্ভুত সরলতা আছে তার চোখে। এই সরলতা এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

নুসরাত জানতে চাওয়ার আগেই আলাদিন বলেছে সব। বলেছে তার বাবার নোংরামির কথা, মানুষের নোংরামির কথা। সব সামাল দিয়েছে সে। ব্যবসা সামলিয়েছে। ব্যবসার অংশীদারদের হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। ব্যবসা বড় করার চেষ্টা করছে। সব বলেছে আলাদিন। বলেছে, 'ক্লান্ত লাগে, নুসরাত। গল্প করার কেউ নাই, বুঝলা। আমি বড় একা।'

নুসরাতের সাথে অনেক আলাপ হয়েছিল সেদিন। একসাথে খেয়েছে। ঘুরে বেড়িয়েছে। নুসরাত আরো জানতে পেরেছে, ভোলায় একটা ব্রিজ হবে। সেই ব্রিজের ইট-সিমেন্ট সাপ্লাইয়ের কাজ পেয়েছে আলাদিন। অনেক টাকার কাজ। নুসরাত লোভী হয়। টাকার প্রতি লোভ তার চিরদিনের।

আলাদিনকে বরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। বরকে আগেই চিনত আলাদিন। ইট-সিমেন্টের কাজটা পাবার জন্য অল্প কিছু ঘুষ দিতে হয়েছে। আলাদিন আজকাল এইসব বোঝে। খুব ভালো বোঝে।

নুসরাতের বর আলাদিনের ভালো বন্ধু হয়ে যায়। যখনই নুসরাতের বাসায় আসা হয়, আলাদিন বাদাম, শুকনো লঙ্কা, শিমের ডাল, কুমড়া, বিরুইর ডাল, তিত করলা, মিষ্টি কুমড়া, আম, কাঁঠাল এসব নিয়ে আসে। ভোলায় সবকিছুই যেন সস্তা। মেয়েরা উপহার পেলে খুশি। নুসরাতও আলাদিনের বাসায় আসা-যাওয়াটা মেনে নেয়। বিরক্তির জায়গা এসে দখল করে ভালো লাগা। আলাদিন তার ভালো চায়। এটা-ওটা নিয়ে আসে। বিনিময়ে নুসরাত তার সাথে গল্প করে। ব্যস, অপরাধ তো নয়।

ভালোই কাটে দিন। তারপর একদিন খবর আসে, নুসরাত চলে যাবে বাগেরহাটে। তার বরের বদলির চাকরি। বাগেরহাটে টাকাপয়সা আয় করবার সুযোগ আরো বেশি। নুসরাত খুশি হয়। বরের উন্নতিতে তার মুখে হাসি ফোটে। আলাদিনকে কিছু জানানো হয় না। জানানোর প্রয়োজন মনে করে না কেউ। আলাদিন কে?

আলাদিন জেনে যায়। সে এখন বড় ব্যবসায়ী। আর ছোট্টটি নেই। বোকা নেই। সে গোপনে বদলি ঠেকানোর চেষ্টা করে। লাভ হয় না। দেরি হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে টাকা থাকলেও অনেক কিছু করা সম্ভব না।

আলাদিনের মন খারাপ হয়। ভীষণ মন খারাপ হয়। আলাদিন ঢাকায় যায়। মন ভালো করবার চেষ্টা করে। কাজ হয় না। তারপর হংসরাজ লঞ্চে চেপে এক সকালে চলে আসে ভোলা। ব্যাগের ভেতর ঢাকা থেকে নিয়ে আসা একটা হাতুড়ি শুধু। নুসরাতের বাসায় যাবার সময় তার প্রিয় আনারস কিনে নিয়ে যাওয়া হয়। চোখে পিঁচুটি নিয়ে নুসরাত বাড়ির দরজা খোলে।

তার বর লক্ষ্মী। সকালে ফ্রিজ থেকে পাউরুটি আর কলা বের করে খেয়ে চলে যায় অফিসে। নুসরাতকে বিরক্ত করে না। বাড়ির কাজের মেয়েটা দরজা আটকায়। নুসরাত ঘুমায় সময় নিয়ে। পেটে বাচ্চা। এই সময়ে ঘুম, খাওয়াদাওয়া ঠিকঠাক মতো হওয়া দরকার।

আলাদিনকে দেখে একটু বিরক্ত লাগে। ঘুম ছেড়ে উঠতে হলো, তাই। অন্য কোনো কারণ নেই।

চোখের পিঁচুটি ধুয়ে নিয়ে আলাদিনের সামনে বসে। আলাদিন নুসরাতকে দেখে। কী সুন্দর! কাজের মেয়েটা আনারস কেটে নিয়ে আসে। নুসরাত খায়। আলাদিন খায় না। নুসরাত খায়, কাজের মেয়েটা খায়, নুসরাতের বাচ্চাটা খায়। তারপর হুঁশ হারায়। গভীর ঘুমে ডুবে যায়। আলাদিন খুশি হয়। আনারসে যে ঘুমের ওষুধ মেশানো হয়েছে, সেটা কাজ করল দেখে ভালো লাগে।

আলাদিন হাতুড়ি দিয়ে বাড়িটা মেরেই বসে। হুঁশ নেই–এটা আরো ভালোভাবে নিশ্চিত হবার জন্য নুসরাতের মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে আলাদিন। একটা-দুটো–এভাবে আঘাত করতেই থাকে। তারপর থেঁতলানো মাথার নুসরাতকে নিয়ে বের হয়। কেরোসিন ঢেলে বাড়িতে লাগানো হয় আগুন। নুসরাতের বাচ্চাটা আর কাজের মেয়েটা ভেতরে। ওরা পুড়ুক। পুড়ে ছাই হোক। কোনো প্রমাণ থাকল না।

নুসরাতের দেহটা নিজের গাড়িতে ওঠায় আলাদিন। তারপর যায় হংসরাজ লঞ্চের দিকে। আজ সন্ধ্যায় লঞ্চ আবার রওনা দেবে ঢাকার উদ্দেশে। নুসরাতকে ঢাকায় নিয়ে যাবে আলাদিন। এখন থেকে নুসরাত শুধু তার। শুধু তার।

২.

এইতো সন্ধে এখন।

মরে যাওয়া নিস্তেজ আলো লেপটে আছে আকাশে। হংসরাজ ছাড়ার কথা এ সময়। ছাড়ছে না।

আলাদিন মালিক, তবু শুনছে না তার কথা কেউ। হংসরাজের ছোট্ট একটা কেবিনে নুসরাতকে বুকের মধ্যে নিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে আলাদিন। রক্ত চারপাশটায়। শুকিয়ে গেছে।

কেবিনে ঢোকার পর থেকে আলাদিন অনেক গল্প করেছে নুসরাতের সাথে। গল্প করছে। এইতো চেয়েছিল সে। তবু কেন জানি শান্তি পাচ্ছে না। নুসরাতের কাচ ভাঙা হাসিটা মিস করছে। মেয়েটা তার গল্প শুনে হাসত। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর হাসি। মনে হতো, সে হাসিতে কাচ ভাঙছে। আহারে সুন্দর! এই সুন্দরেই বেঁচে থাকতে হয়। বেঁচে থাকার ইচ্ছে জাগে। আলাদিনের অনেক দিন বাঁচার ইচ্ছে।

সে উপায় নেই। পুলিশ ঘিরে ফেলেছে লঞ্চ। মাইকিং করা হচ্ছে। তাকে কেবিন থেকে বের হতে বলা হচ্ছে। জড়ো হয়েছে রাজ্যির লোকজন। তারা আলাদিনের শাস্তি চায়। সবাই টের পেয়েছে তার কথা। খুব তাড়াতাড়ি জানাজানি হয়েছে। কেবিনের দরজা ভাঙার চেষ্টা চলছে। এভাবে চায়নি আলাদিন। কেউ তাকে ভালোবাসল না। সেই শৈশব থেকে শুধু ঘৃণা করেই গেল। কেউ কি আলাদিনের জন্য একটু মন খারাপ করবে? দুঃখ করবে? তার কষ্টটা বুঝবে? তার গল্পটা শুনতে চাইবে?

আলাদিনের কেউ নেই। আলাদিনের কেউ কখনোই ছিল না। আলাদিনের মতো অমানুষদের জন্য কেউ থাকে না। হায়রে।

আলাদিন পকেট থেকে দেশলাই বাক্সটা বের করে। কেরোসিন দিয়ে ভেজায় নিজের আর নুসরাতের শরীর। নুসরাতকে কাছে টেনে বলে 'ভালোবাসি। শোনো, অনেক গল্প আছে। মন দিয়ে শুনবা কিন্তু। আচ্ছা?' এরপর আগুন জ্বালায়। জ্বলতে থাকে সবকিছু। বাইরে থেকে লোকজন শুনতে পায় আলাদিনের চিৎকার। শরীর পোড়ার যন্ত্রণা ভয়ংকর। কী অদ্ভুত আলাদিনের প্রেম। কী ভীষণভাবে নিজেকে শেষ করে দেওয়া। জয়তু আলাদিন। আলাদিন জিন্দাবাদ। আলাদিন পুড়ুক। পুড়ে পুড়ে মরুক। মরেই শান্তি পাক। জীবিত থাকাকালে তো পুড়তেই হয়েছে সারাক্ষণ...।